KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩৫/৪ [illegible] [illegible], কল-[illegible]
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : অনুষ্টুপ	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number :	Year of Publication : জানুয়ারি ১৯৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible] চক্রবর্তী, [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব

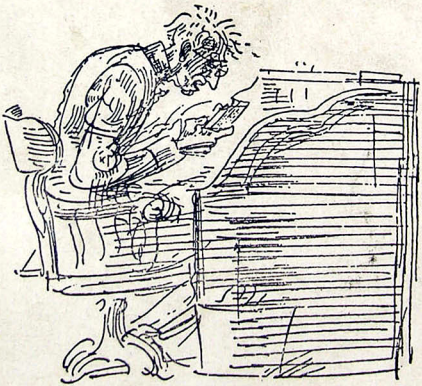

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব

জানুয়ারী—১৯৯৪

এই সংখ্যায় যাদের লেখা আছে

জঁা ফ্রাসোয়া লিওতার্দ
পার্থ মুখোপাধ্যায়
মৌসুমী মান্না
জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌশিক ঘোষ
স্যামুয়েল বেকেট
স্বপন হালদার
মনীষা ব্যানার্জী
চিরঞ্জয় চক্রবর্তী
সুজান সন্ট্যাগ
শ্যামলতরু মুখোপাধ্যায়
রত্নদীপ ঘোষ

☐ চিঠি দেবাশিস সরখেল ☐ পুনঃ মুদ্রিত প্রতিবেদন সুকান্ত মণ্ডল

প্রচ্ছদ : রেজানল্ড মার্শ

সম্পাদনা : মনীষা ব্যানার্জী এবং শ্যামলতরু মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ : অনুমায়া প্রেস, ২৯, বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলি—৯

যোগাযোগ : ১৩৫/৪ ভুবনমোহন রায় রোড, কলি—৮

বিনিময় : ২০ টাকা

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব

অন্তর্দ্বন্দ্ব

পাঠক : তসলিমা নাসরীনের লেখা পড়েছেন ? কেমন লাগলো ?

সম্পাদক : পড়েছি। জোরে নয়।

পাঠক : তসলিমা নাসরীনকে একজন লেখক হিসেবে ভাবতে পারেন ?

সম্পাদক : আপনারা যে পাঠক তার কি প্রমাণ আছে ? কাগজ কিনেছেন বলে ?

পাঠক : যাক গে। কোনো বড়ো খবরের কাগজে এই ধরুন আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, ওভারল্যাণ্ড, যুগান্তর, প্রতিদিন, প্রতিবেদনে আপনাদের কাগজের রিভিউ দেখতে পাইনি। কেন ?

সম্পাদক : পাঠাইনি।

পাঠক : এক্ষণ, অনুষ্টুপ, পরিচয়, প্রমা ঐ ধরণের কাগজেও তো রিভিউ দেখিনি।

সম্পাদক : পাঠাইনি।

পাঠক : কেন ? হবে না ?

সম্পাদক : তা নয়। হলেও হতে পারে তবে…

পাঠক : আচ্ছা, এস. এস. সি তো উঠে গ্যালো ? কি মনে হয় ?

সম্পাদক : জেনিভার সংস্থা তো উঠে যায়নি। সান তো আছেই।

পাঠক : আগামী লোকসভা নিবাচনে বি. জে. পি এলে কেমন হয় ?

সম্পাদক : ভালোই। কলা-দুধ খাবো। গরুর মাংস গরম দেশ বলে সহ্য হচ্ছে না। বাঙালীর ঘা ক্রিমির ধাত শুয়োরের মাংসও…

পাঠক : টিভি, সিরিয়াল ছাখেন ?

সম্পাদক : কেন দেখবো না, আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লেখকদের গল্প উপন্যাস সব—

পাঠক : যাঃ। ইয়ারকি করছেন ? নাটক ফাটক ছাখেন ?

সম্পাদক : ফাটক দেখি। এইতো সেদিন

পাঠক : আবার ফাজলামো করছেন। আচ্ছা কংগ্রেস কি পশ্চিমবঙ্গে আবার ফিরে আসবে ?

সম্পাদক : তা বলতে পারবো না। তবে কংগ্রেস (মা) কোনো দল এলেও, আসতে পারে।

পাঠক : বেশ বলেছেন। গান-টান শোনেন ?

সম্পাদক : কি মুস্কিল ? কেন শুনবো না ; সুমন, নচিকেতা শুনেছি। এখন যদি জিজ্ঞাসা করেন কেমন লাগলো গরম, না ঠাণ্ডা ?

পাঠক : হাঃ হাঃ, যাক বাজে কথা অনেক হোলো। পোস্ট-মডার্নইজম ব্যাপারটি কি ?

সম্পাদক : অন্যর মুখে ঝাল খাওয়ার ব্যাপারে আমরা আস্থাশীল নই, সেইজন্য এ ব্যাপারে মূল দার্শনিক লিওতার্দের একটি লেখা রেখেছি ১ম সংখ্যায় Deconstruction-এর কথা মাথায় রেখে দেরিদার লেখা রেখেছিলাম। বাংলা ভাষায় প্রাবন্ধিক বলতে যদি শঙ্খ ঘোষ বোঝেন তবে অনুরোধ করবো রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে উপন্যাসের যে সমালোচনা লুকাচ্ করেছিলো সেটাকে ঠোনা দিয়ে যা একটা লিখেছিলো কি বলবো স্যার ; আবার তিনি শিশির দাসের বইয়ের উপর…

পাঠক : আপনারা কিন্তু এখানে বাখতিনের কোনো লেখা রাখেননি ?

সম্পাদক : তা যদি বলেন আপনাদের ভাষায় বলি, রেসপন্স খুবই পুওর। পয়সা দিয়ে কে আর এইসব ছাইপাশ কাগজ কেনে? দেশ টেশই কিনবে। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় ভেতাঁ তোদরভের লেখাটি দেখতে পারেন।

পাঠক : আপনার কাগজে কেন কোনও বিখ্যাত লেখকের লেখা বা সাক্ষাৎকার ছাপা হয় না?

সম্পাদক : বিখ্যাত বলতে যদি পপুলারিটি বোঝানো হয় তবে এটাও বোঝা দরকার, কাদের কাছে পপুলার। তাদের মতামত আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কি? সেই পাঠক বহু লেখা একবার করে পড়ে, নাকি কয়েকটা লেখা বার বার পড়ে? বিখ্যাত লেখক মানেই যে বড় মাপের লেখক সে কথা কে বলল, আর তা যখন নয়, তখন পাঠকের সময়ের গুরুত্বটাও তো বোঝা দরকার? আমাদের কাছে ঠিক যতটা গুরুত্বপূর্ণ একজনের মনের গভীরের কথাটা [যদি সে লেখক নাও হয়] ঠিক ততটাই গুরুত্বহীন একজন লেখকের পরিচিতি।

পাঠক : আচ্ছা ডিসেম্বর তো শেষ হতে চললো ষ্টলগুলোয় এখনও শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার দেশ…

সম্পাদক : দেখুন আদার ব্যাপারী; জাহাজের খবর…

মনীষা ব্যানার্জী এবং শ্যামলতরু মুখোপাধ্যায়

জাঁ ফ্রাসোয়া লিওতার্দ

উত্তর আধুনিকাবাদটি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে

দাবী

এই যুগটাই গাছাড়া। আমি এই যুগের প্রতিটি মুহূর্তের কথা বলব। যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা তা শিল্পকলাই হোক বা অন্যত্র; তাকে বন্ধ করার জন্য চারিদিক থেকে একটা চাপ আসছে। আমি একজন কলা সংক্রান্ত ঐতিহাসিকের লেখা পড়েছি, যিনি বাস্তববাদের প্রভূত প্রশংসা করেছেন কিন্তু নতুন বিষয়িতা দেখলেই ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করছেন। একজন কলা সমালোচকের লেখা পড়েছি শিল্পের বাজারে যিনি মোড়কে মুড়ে আন্তর্ভাগার্দ মতবাদটিকে বিক্রি করছেন। আমি এও পড়েছি যে "উত্তর আধুনিকতার নামে স্থপতিরা "বাউহাউস পরিকল্পনা" পরিত্যাগ করছেন। প্রাথমিক অবস্থায় গবেষণাটি বাতিল করছেন এবং সেই সঙ্গে অস্বীকার করছেন শিল্পকলা সংক্রান্ত গবেষণার তত্ত্বগুলিকে। আবার একজায়গায় আমি পড়লাম একজন নতুন দার্শনিক এক নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করেছেন যাকে মজা করে বলছেন, ঘিয়োভার খ্রীষ্টতন্ত, যার সাহায্যে তিনি না কি আমাদের অধার্মিকতার অবসান ঘটাতে চান। ফরাসী কিছু পত্রিকাতে দেখা যায় যে কেউ কেউ

গুয়াত্‌তারি এবং হুল্যাজ-এর দ্বারা সম্পাদিত "মিল প্লাটো-"র ওপর অখুশি কারন দর্শন পড়তে গিয়ে সামান্য অর্থ না বুঝেও তৃপ্ত হতে হবে বা ভাল বলতে হবে। বিখ্যাত এক ঐতিহাসিকের লেখায় দেখেছি: ১৯৬০—১৯৭০ সালের আভাগার্দ লেখক এবং চিন্তাবিদরা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ভয়ানক আতঙ্ক প্রচারের কথা এবং তিনি বলছেন বুদ্ধিজীবির মুখে সাধারণের ভাষা লাগিয়েই কার্যকরী ভাব বিনিময়ের শর্তগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; এমনকি ঐতিহাসিককেও। ভাষা চর্চার এক তরুণ দার্শনিক অভিযোগ করেছেন যে মহাদেশীয় চিন্তাধারা, যান্ত্রিক ভাষা মাধ্যমের চ্যালেঞ্জের কাছে পরাজয় স্বীকার করছে ফলে বাস্তবতা ছেড়ে শংসামূলক শব্দের প্রত্যয়গত উদাহরণ মালার বিকল্প হয়ে উঠছে অর্থাৎ অপভাষাচর্চা কারণ বাক্ নিয়ে কথাবার্তা বলা, লেখা নিয়ে লেখালিখি করা, আন্তঃপাঠমূলক ক্রিয়াকর্ম এবং মনে করছেন তার একটা স্থায়ী চেহারা রেফারেন্টের মধ্যে পুনরধিষ্টিত করার সময় এসেছে। আমি একজন প্রতিভাবান নাট্য বিশারদকে জানি, তিনি বলেন, যে রাজনৈতিক প্রভুত্বের কাছে উত্তর আধুনিকতা মতবাদটি তার রহস্য এবং ক্রিয়াকলাপ সহ কমই গুরুত্ব পায়। বিশেষত, আনবিক যুদ্ধের আতঙ্কের কারণে যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জনমত, সর্বগ্রাসী শাসন যন্ত্রের অতন্দ্র তত্ত্ববধানকেই উৎসাহ দিয়ে থাকে।

আমি একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের লেখা পড়েছি যিনি আধুনিকতাকে নবরক্ষণশীলতার হাত থেকে রক্ষা করছেন। উত্তর আধুনিকতাবাদ পতাকার নিচে তিনি বিশ্বাস করেন নয়া রক্ষণশীলতা আধুনিকতার (ইন্‌লাইটেনমেন্ট) অসমাপ্ত কর্ম-পরিকল্পনা পরিত্যাগ করবে। তার কথা অনুযায়ী ইন্‌লাইটেন-মেন্টের শেষ প্রবক্তারা যেমন পপার এবং আডোর্নো—জীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই কর্ম-পরিকল্পনাটি রচনা করতে সক্ষম; যেমন, দি ওপেন সোসাইটি লেখকের জন্য রাজনীতি এবং এসথেটিক থিয়োরী লেখকের জন্য শিল্পকলা। য়্যুরগেন হ্যাবারমাস মনে করেন আধুনিকতা যদি পরাজয় মেনে থাকে তবে তা ঘটেছে জীবনের সম্পূর্ণতাকে বিভিন্ন স্বাধীন অবস্থা যা কি না দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্কীর্ণ প্রতিযোগীতায় ভাগ হতে দেওয়ার জন্যই। যখন একদিকে সঠিক বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষজন অবয়বহীন আকার এবং নিকৃষ্ট চিন্তাধারা অভিজ্ঞতায় লাভ করছে; কোনও মুক্তি হিসাবে নয় একটা বিশাল অবসাদের মধ্যে লাভ করছে যা বহুবছর আগে বোদলেয়র বর্ণনা করে গিয়েছিলেন।

অ্যালব্রেশট ভেলমারের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী হ্যাবারমাস মনে করেন জীবন ও সংস্কৃতির এই যে বিভাজন তা দূর করবার দাওয়াই হচ্ছে নান্দনিক অভিজ্ঞতার অবস্থাটিকে পরিবর্তন করা যখন এটা আর কোনও ভাবেই আমাদের রুচির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে প্রকাশ পায় না কিন্তু কোনও জীবন্ত ঐতিহাসিক অবস্থাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এটা এভাবে বলা যায় আমাদের টিকে থাকার সমস্যার সঙ্গে যখন জড়িত। এই জন্যই এই অভিজ্ঞতাটি তখন আর নান্দনিক সমালোচনার পর্যায়ে থাকে না; হয়ে ওঠে ভাষার কচকচালি। আমাদের আদর্শ নিষ্ঠ আকাঙ্খার এবং বোধশক্তি অর্জনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, এমনকি ধরনটিকেই পাল্টে দেয় যার মধ্যে ঐ সকল বিভিন্ন মুহূর্ত একে অন্যকে উল্লেখ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, হ্যাবারমাস শিল্প ও অভিজ্ঞতার কাছে যা আশা করে তা হচ্ছে বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে মেলবন্ধন: ঐক্যের দুয়ারটি খুলে দেওয়া।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্থির করা: হ্যাবারমাসের মগজে কি ধরনের ঐক্যের গল্প অছে? আধুনিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য কি সমাজ-সংস্কৃতির ঐক্য গঠন করা? যার মধ্যে চিন্তা এবং দৈনন্দিন জীবনের উপাদানগুলো সুসংগঠিত সংঘাতের ন্যায় তাদের জায়গা দখল করে? জ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র এবং রাজনীতি এই তিনটিকে নিয়ে বিভিন্নধর্মী ভাষাচর্চার যে ছক করা হয়েছে সেটা কি একটি অন্য বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত? যদি তাই হয় তাদের মধ্যে একটা কার্যকরী সমন্বয় কি সম্ভব?

প্রথম অনুমানটি যা মূলত হেগেলীয়, দ্বান্দিক অর্থে অভিজ্ঞতার সামগ্রিক প্রত্যয়টিকে অভিযুক্ত করে না। দ্বিতীয়টি বরং কান্টের ক্রিটিক অব জাজমেন্টের কাছাকাছি; কিন্তু ক্রিটিকের মত নিষ্ঠুর পুনঃপরীক্ষা তাকে করতে হবে। কেননা, একটি বিষয় এবং ইতিহাসের ঐক্যমূলক সমাপ্তির ধারনাটি উত্তর আধুনিকতা ইন্‌লাইটেনমেন্টের ঘাড়ে চাপাচ্ছে, এটা হচ্ছে সেই সমালোচনা যেটা শুধু উইটগেনস্টাইন এবং আডোর্নো শুরু করেছে তা নয় কিছু ফরাসী এবং অন্যান্য চিন্তাবিদ; অধ্যাপক হ্যাবারমাস যাদের পড়ে কৃতজ্ঞ করতে পারেননি—যা কিছুটা তাদের নয়া রক্ষণশীলতার জন্য বেশি নম্বর পাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বাস্তববাদ :

আমার দাবিগুলি সব সমান নয়। পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। কোন দাবী উত্তর আধুনিকতাবাদ মতবাদটির সমর্থনে কোনওটি তা খণ্ডন করার জন্য। কিছু রেফারেন্ট (এবং বস্তুগত বাস্তবতা), কিছু কিছু বোধ (এবং বিশ্বাসযোগ্য অজ্ঞেয়তা) প্রাপক (এবং পাঠকবর্গ), অথবা একজন বক্তা (এবং বিষয়গত প্রকাশযোগ্যতা) অথবা কিছু যোগাযোগমূলক সহমতের জন্য (বিনিময়ের জন্য এক সাধারণ নিয়ম যেমন ঐতিহাসিক বিতর্কের ধরণ) একটি দাবীকে সূত্রবদ্ধ করা প্রাথমিক অর্থে এক ব্যাপার নয়। শৈল্পিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করার বিক্ষিপ্ত অভিযোগের মধ্যেও আবার ছাখা যায় নিরাপত্তা, ঐক্য এবং শৃঙ্খলার জন্য অভিন্ন আহ্বান। অথবা জনপ্রিয়তা (পাঠককে ধরতে হবে)। শিল্পী এবং লেখকদের সমাজের মর্মস্থলে নিয়ে আসতে হবে। সমাজ যদি অসুস্থ হয় কমপক্ষে শুশ্রূষা করার দায়িত্ব তাদের দিতে হবে।

এই সাধারণ ব্যবস্থার অকাট্য লক্ষণ হচ্ছে : এটা ঐ সকল লেখকদের জন্য যাঁদের কাছে আভাগার্দদের উত্তরাধিকারীকে সমূলে বিনষ্ট করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত আন্তর্দেশীয় আভাগার্দ মতবাদের ক্ষেত্রে; এব্যাপারে বার্নার লামার্শ ভাদেল এবং মিশেল অঁারিকের প্রশ্নের পরিপেক্ষিতে আশীল বোনিতো আলভা যে উত্তর দিয়েছিল তারপর আর কোনও কথাই হতে পারে না। এই গোলোযোগের মধ্যে সামনা সামনি আক্রমণের তুলনায় আভাগার্দদের শ্বাসরুদ্ধ করার ব্যাপারে শিল্পী ও সমালোচকরা অনেক বেশি দৃঢ়বল ছিল। কারণ পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড অংশগুলি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটি রাস্তা হিসেবে তারা তাদের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যসুলভ মানসিক ঔদার্যটাকে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে। যদি তারা খোলাখুলি আক্রমণ করতো নয়াতত্ত্ববাদী হিসেবে হাস্যাস্পদ হওয়ার ঝুঁকি নিতে হতো। যখন বুর্জোয়ারা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠিত করছে, একমাত্র স্থ্যাল এবং একাডেমী, রেচন অঙ্গের মতো কাজকর্ম করে যেতে সক্ষম ছিল, সক্ষম ছিল বাস্তববাদের মলাট লাগানো পরিবর্তনসাধ্য এবং সাহিত্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে পুরস্কার প্রদানে। ধনতন্ত্র তার সহজাত ক্ষমতার বলে আমাদের পরিচিত বিষয়, সামাজিক কাজকর্ম এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে এমন এক পর্যায়ে মিথ্যে করে

তুলছে, গতানুগতিক বাস্তব উপস্থাপনা কোনভাবেই বাস্তবকে আর জাগিয়ে তুলতে পারছে না। ফলে এক ধরণের স্মৃতিচারণ অথবা বিদ্রূপ এর বেশী কিছু নয়। পরিতৃপ্তির জায়গায় এক ধরনের যন্ত্রণার অনুষঙ্গ বলা যায়। ক্লাসিসিজম বাতিল হয়ে যায় এই কারণে বাস্তবতা এতোটা ভেঙে পড়ে; অভিজ্ঞতার কোনো সুযোগ থাকে না। থাকে শুধু দরকষাকষি করা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো।

হ্বাল্টার বেনিয়ামিনের সমস্ত পাঠক এই বিষয়টিকে জানে। কিন্তু এর শেষটুকুর প্রকৃত মূল্যায়ণ করা জরুরি। আলোকচিত্র কখনোই চিত্রকলার বিকল্প হিসেবে, ছাখা দেয়নি যতোটা শিল্প-সংক্রান্ত চলচ্চিত্র, বর্ণনামূলক সাহিত্যকে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ করেছে। যখন বর্ণনামূলক সাহিত্য সুসংঘটিত সংঘাতের ন্যায় ঐতিহাসিকতার শেষ ধাপে পৌছেছে (১৮০০ শতাব্দীর থেকে শিক্ষামূলক মহান উপন্যাসের শুরু) তখন বরং চিত্রকলা, ১৫০০ শতাব্দীর ইতালীয় রীতি দ্বারা সম্প্রদায়িত পরিকল্পনার শেষ কাজ সম্পন্ন করেছিলো। হস্ত অথবা কারুশিল্পের বিকল্প হিসেবে যন্ত্র এবং শিল্পের গঠন হওয়া উচিৎ। বিপদের কারণ কখনোই তা ছিলো না ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি কেউ বিশ্বাস করে কারিগরী শিল্প আসলে ব্যক্তিমানসের প্রতিভারই একটি প্রকাশ যা অভিজাত কারিগরের দ্বারা পরিচালিত।

বিভিন্ন সচেতনা রক্ষার যে দায়িত্ব এই সন্দেহের বশে তত্ত্ববাদীরা বাস্তববাদীদের হাতে তুলে দিয়েছিলো, বর্ণনামূলক অথবা চিত্র সংক্রান্ত বাস্তববাদের শিল্পীদের তুলনায় তা হাজার গুণ দ্রুত এবং চমৎকার ভাবে আলোকচিত্র শিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী সুসম্পন্ন করতে পারে। চিত্রাঙ্কন এবং উপন্যাসের তুলনায় শিল্প-সংক্রান্ত আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র তখনই বড়ো জায়গা দখল করবে; যখনই সম্বোধনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়গত অবস্থা ছাখা যায়, সহজে চিহ্নিত করা যায় এ রকমের অর্থ দিয়ে মতবাদটি সাজানো যায়, নতুন বাক্যবিন্যাস এবং অভিধানের জন্ম দেওয়া যায় যা সম্বোধনকারীর ধারণা এবং ধারাবাহিক বিষয়গুলোর রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম এবং খুব সহজেই সে তার নিজস্ব চেতনার কাজে পৌছতে পারে এমন কি সম্মতির কাছে যা সে অন্যের কাছ থেকে লাভ করে—যেহেতু ধারণা এবং তার ধারাবাহিক বিষয়সমূহের গঠন তাদের মধ্যে একধরণের যোগাযোগ সূত্র তৈরী করে ফ্যালে। আর এভাবেই বাস্তবতার ক্রিয়া দ্বিগুণ হতে থাকে। অথবা কেউ যদি পছন্দ করে বাস্তববাদের রহস্য।

যা টিকে আছে তাকে যদি কোনোরকম সমর্থন তারা না করে (যদিও এক্ষেত্রে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ), শিল্পী এবং সাহিত্যিক এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে না এবং তারা নিশ্চয়ই চিত্রকলার নিয়ম অথবা বর্ণনামূলক লেখা লিখির নিয়ম কানুন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে যেহেতু সেগুলো পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা এবং শেখা। শীঘ্রই ঐসব নিয়মগুলো তাদের কাছে লোক ঠকানো প্রলুব্ধকর এবং প্রত্যয় জন্মানোর পদ্ধতি হিসেবে উপস্থিত হবে যার ফলে সত্য প্রমান করা অসম্ভব হয়ে উঠবে তাদের কাছে। চিত্রাঙ্কন এবং সাহিত্য নামে এক নজিরবিহীন বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। বাস্তবের যে আকাঙ্খা বিষয় এবং অবস্থা সমূহের দাবী মেটাতে সক্ষম ; সেই শিল্পের নিয়মগুলোকে আর যারা পুনঃ পরীক্ষা করতে অস্বীকার করে, তারা সঠিক নিয়ম কানুনের নামে। সংযোগ মাধ্যমের দ্বারা জনগণের আনুগত্যের মধ্যে এক সমৃদ্ধপূর্ণ প্রগতিপন্থা অনুসরণ করে। পর্ণগ্রাফি ছাড়া শেষ পর্যন্ত ফিল্ম-এবং আলোকচিত্রের প্রয়োগের আর কোনো জায়গা নেই। গণ মাধ্যমের দাবী মেটায়নি যে সকল দৃশ্যত অথবা বর্ণনামূলক শিল্প, তাদের কাছে এটা একটি সাধারণ খাঁচা হয়ে উঠছে।

যেসব শিল্পী এবং লেখক বর্ণনামূলক এবং ছাঁচধর্মী শিল্পকলার রীতিনীতি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে সম্ভবত তারা তাদের নিজস্ব কাজের জন্য অবিশ্বাসভাজনই হয়ে ওঠে। ফলে যারা ব্যক্তিগত পরিচয়, বাস্তব বিষয় সমূহ নিয়ে চিন্তিত তাদের চোখে, ওই সব শিল্পী লেখকের অসম্মানজনক হয়ে ওঠাটা পূর্ব নির্ধারিত থেকে যায়। কারণ এদের কোনো নির্দিষ্ট পাঠকবর্গ নেই। ফলে চিত্রাঙ্কন এবং বর্ণনামূলক শিল্পকলার ক্ষেত্রে গণ যোগাযোগ এবং শিল্প-সংক্রান্ত বাস্তববাদ যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, সেই কারণে আভাগার্দদের দ্বন্দ্বগুলি আরোপ করা সম্ভব হয়। দ্যুসাঁর রেডিমেড কিছুই করে উঠতে পারে না। বরং সক্রিয় এবং ব্যাঙ্গার্থে শিল্পী হয়ে ওঠা অথবা চিত্রাঙ্কনের নিয়মগুলো হজম না করার পদ্ধতির গুরুত্ব প্রকাশ করে। অর্থাৎ Thierry de Duve তীব্রভাবে যা লক্ষ্য করেছে আজকের নান্দনিক প্রশ্ন কি সুন্দর তা নয়, কি প্রকৃত শিল্প।

বাস্তববাদ, যার একমাত্র সংজ্ঞা শিল্প-সংশ্লিষ্ট বাস্তব প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া, সবসময়ই তত্ত্ববাদ এবং কিটশ (kitsch) কালচারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। যখন একটি পার্টি বলতে ক্ষমতাই বোঝায় ; ঠিক তখন গবেষক আভাগার্দদের নিষিদ্ধ কোরে, কুৎসা কোরে ; বাস্তববাদ এবং তার প্রিয় ক্লাসিসিজম

জয়যাত্রা সম্পূর্ণ করে ফ্যালে—অর্থাৎ জনগণের বিষন্নতা এবং উদ্বিগ্নতার প্রকৃত দাবাই হিসেবে সঠিক চিত্র, সঠিক বর্ণনা সঠিক কর্ম পাটি যা তাদের কাছে আশা করে। বাস্তবের নিশ্চয়ই এই যে দাবী অর্থাৎ ঐক্য, সারল্য, যোগাযোগ ইত্যাদি নিশ্চয়ই বিপ্লবের পর রাশিয়ান সমাজে এবং দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে যাবার পরে জার্মান সমাজে একই গুরুত্ব একই গতিশীলতার সঙ্গে আর নেই যা নাৎসী এবং স্টালিনবাদী বাস্তবতার পার্থক্য চেনার একটি ভিত্তিস্বরূপ।

যাই হোক ; এটা পরিষ্কার, শিল্প সুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে রাজনৈতিক পার্টির আক্রমণ করা বিশেষভাবে প্রগতি বিরোধী। নান্দনিক বিচারবোধের তখনই প্রয়োজন দ্যাখা দেয়, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনকে যখন তা আক্রমণ করে অর্থাৎ এটা শিল্প সম্মত, ওটা নয় এটা প্রকৃত শিল্প কিনা, এর প্রকৃত পাঠকবর্গ পাওয়া যাবে কিনা তা অনুসন্ধান না করে রাজনৈতিক তত্ত্বাগীশরা আগে ভাগে নন্দনতত্ত্বের একটা বিচারের মান ঠিক করে ফ্যালে এবং এক ঝটকায় চিরকালের জন্য কিছু শিল্পকর্মকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নান্দনিক বিচার বোধের ক্ষেত্রে মূল আকার সমূহের ব্যবহার, বৌদ্ধিক বিচারের মতোই হয়ে উঠবে। কান্টের মতো বলা যায় ; দুটোই সীমাবদ্ধ অবধারন। বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে প্রথমটি সুসংঘটিত দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতায় বাঁধা।

যখন ক্ষমতা বলতে পার্টি নয়, পুঁজির ক্ষমতা বোঝায় ; আন্তর্আভাগার্দ-বাদ অথবা উত্তর আধুনিকতাবাদকে একটি মানানসই সমাধান বলা যায়। মানসিক ঔদার্যই হচ্ছে সমকালীন সাধারণ কৃষ্টির নিম্নতম মান অর্থাৎ রক্ সংগীত শোনা, পশ্চিমের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করা, লাঞ্চে ম্যাকডোনাল্ড খাদ্যভক্ষণ, ডিনারের জন্য স্থানীয় রন্ধনপ্রণালী, টোকিও বসে প্যারিসের পারফিউম ব্যবহার করা, হংকংয়ে বসে অতীতের পোষাক পরিধান আর জ্ঞানার্জন বলতে টিভিগেম। অ-দ্বান্দিক ক্রিয়াকলাপের জন্য লোকজন পাওয়াটা কঠিন নয় কেননা পৃষ্টপোষক-দের রুচির মধ্যে যে বিভ্রান্তি বিরাজ করে তাকে একরকম মদত করে এই শিল্প, এই কিটশ কালচার। চলছে চলুক এই বাধেই শিল্পগণ, গ্যালারীর মালিক, সমালোচক, জনগণ, পশুর মতো গড়াগড়ি দিচ্ছে। এভাবেই গা আলগা দেওয়া যুগের সুচনা। ফলে এই যে বাস্তবতা যেখানে কোন নান্দনিক বিচারের মানদণ্ড নেই সব কিছুই সমগ্র শিল্পকর্মই বিচার হচ্ছে কতো টাকা রিটার্ন দেবে। ফলে সবরকমের প্রবণতা এবং অভাবের ক্রয়মূল্য থাকে বলে এ ধরণের বাস্তবতা সমস্তরকমের প্রবণতাকেই মানিয়ে নেয় যেরকম পুঁজি সবরকমের

অভাবকেই মেটায়। একজন শুধু যখন ভোগবিলাসের চিন্তা করে তার কাছে সূক্ষ্ম রুচির কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

সাহিত্য এবং শিল্পের রিসার্চ-কর্মটি এভাবেই কুঁকড়ে থাকে; একদিকে সরকারের সাংস্কৃতিক বিধি, অন্যদিকে তার বাজার। দুটি চ্যানেল আছে। একটি দিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়; জনগণ যে বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত তারই উপর যেন লেখালেখি হয় আর একটি চ্যানেলের নব্ ঘোরালে পাওয়া যাবে রচনাটি এমনভাবে তৈরী করা হবে জনগণ যেন চিনতে পারে; বিষয়টি কি বুঝতে পারে, পছন্দটি যেন অস্বীকার করতে পারে। যদি সম্ভব হয় একটু আমোদ যেন পাওয়া যায়।

শিল্প-সংক্রান্ত ও যান্ত্রিক কলা এবং সাহিত্য ও বিশুদ্ধ কলার মধ্যেকার সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা এইমাত্র দেওয়া হয়েছে কাঠামোগত ভাবে সেটা সম্ভব কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক উপস্থাপনার দিক দিয়ে কিছুটা সঙ্কীর্ণ, একমুখী। আমরা যদি বেনিয়ামিন এবং আডোর্নোর স্বল্পবাক্যকে না ছাড়িয়ে যাই তবে দেখতে পাবো কলা এবং সাহিত্যের তুলনায় শিল্প এবং বিজ্ঞান বাস্তবতার প্রসঙ্গে কম অভিযুক্ত নয়। অন্যথায় প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের মেফিস্টোসুলভ কর্মকাণ্ডের মানবিক প্রত্যয়টি বেশী মদত দেওয়া হয়; এটাই বিশ্বাস করা হবে। এটা আর আজকে অস্বীকার করা যায় না প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের কর্তৃত্বময় অস্তিত্বটি অর্থাৎ উৎকর্ষতার সবচেয়ে প্রশংসনীয় গোড়ায় পৌঁছতে গেলে চিন্তাপ্রসূত বিবৃতিকে ব্যাপক অধীনস্থা স্বীকার করে নিতে হবে; প্রকারান্তরে যা প্রযুক্তিগত বিচারের মান। শিল্পীদের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যান্ত্রিক এবং শিল্প-সংক্রান্ত কলা প্রথাগত ভাবে প্রবেশ করছে ফলে তুলনায় অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক বিচারস্কের মধ্যে যে চিন্তা এবং বিষয়সমূহ জন্মলাভ করে তা একটি নিয়মকেই সমর্থন করে থাকে: বাস্তবতা বলে কিছু নেই যতোক্ষণ না একটি নির্দিষ্ট জ্ঞান এবং দায়বদ্ধতার কারণে তৈরী হওয়া মতৈক্য কর্তৃক তা পরীক্ষিত হচ্ছে।

এই নিয়মটির গুরুত্ব কম নয়। অধিবিদ্যামূলক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নিশ্চয়তার কারণে বাস্তবের এক ধরনের এই যে অপসৃয়মানতা তার ছাপ বিজ্ঞানী এবং পুঁজি-রক্ষাকারীর রাজনীতির মধ্যে স্থাপা যায়। বিজ্ঞান এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের কারণেই বাস্তবের এই অপসৃয়মানতা চূড়ান্ত অর্থে জরুরী। এ্যারিস্ততলের গতিসূত্রের উপর যদি সন্দেহ প্রকাশ না করা যেত

কোনো শিল্প গড়াই সম্ভব হোতো না। দেহবাদ, বণিগবৃত্তি, যৌথসংস্থার তত্ত্বকে যদি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন না করা যেতো এই শিল্পের জন্ম সম্ভব হোতো না। আসলে আধুনিকতা যে যুগেই আসুক না কেন সমস্ত পুরোনো বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে, বাস্তবের মধ্যে "বাস্তব সত্তার অভাব, আবিষ্কার করে; বাস্তবের অন্যদিক সমূহের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাকে ভূমিষ্ট হতে হয়েছে।

যদি কেউ সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক এই ব্যাখ্যা থেকে এট্য বের করতে চেষ্টা করে; বাস্তব সত্তার অভাবটি কি আমরা দেখতে পাবো নিৎশের শূন্যবাদের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা আছে। কাণ্টের মহান ধারণাটির মধ্যে আমি নিৎশের প্রথম দিককার এক কণ্ঠস্বর শুনেছি। আধুনিক শিল্প-সাহিত্য এবং আভাগার্দদের যুক্তির স্বয়ং প্রমাণিত সত্যটি কাণ্টের মহান ধারণার কাছ থেকেই পাওয়া বলে আমি মনে করি।

কাণ্টের ধারণা অনুযায়ী মহান অনুভূতি একই সঙ্গে দ্বার্থক এবং বলিষ্ঠ আবেগ; যন্ত্রণা এবং আনন্দের মিশ্রণ। বলা যায় যন্ত্রণা থেকেই আনন্দের উৎপত্তি। যে প্রসঙ্গটি অগাষ্টিন এবং দেকার্তের দ্বারা উপস্থাপিত তা কিন্তু কাণ্ট মহাশয় চ্যালেঞ্জ করেননি (অনেকে যে দ্বন্দ্বটিকে মর্মকাম বলে চালাতে চান) বরং কোনো কিছুকে ধারণ করার যে শক্তি এবং উপস্থাপনা করার যে শক্তি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব হিসেবেই প্রতিভাত জ্ঞানের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যদি প্রথমত বিবৃতি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় এবং দ্বিতীয়ত নিদর্শনগুলি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত হয়। সৌন্দর্যের পরিচয় তখনই আমরা পাই যখন কোনো শিল্প কর্ম কোনোরকম ধারণাযোগ্য নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই প্রথমে একটি সংবেদন সৃষ্টি করে (শিল্পকর্মটি আনন্দের অনুভূতিটি স্বাধীন অর্থে টেনে বার করতে পারে) এবং যা একটি সার্বজনিন ঐকামতকে নাড়া দেয় (যা কোনোদিন নাও সম্ভব হতে পারে।)

কল্পনা করার ক্ষমতা এবং ধারণাযুক্ত কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা করার যে ক্ষমতা; এই দুইয়ের মধ্যে রুচি এক নিয়মবর্জিত অস্থিরীকৃত চুক্তিকেই প্রকাশ করে, এমন এক অবধারনের জন্ম স্থান কাণ্টের বিচারে যা সচেতনামূলক অর্থাৎ আনন্দেরই অভিজ্ঞতা বলা যায়। মহান-ধারণাটি আসলে একটি ভিন্ন অনুভূতি বরং এটি তখনই ঘটে যখন কল্পনা কোনো একটি বিষয়কে ধরতে ব্যর্থ হয় কিন্তু নীতিগতভাবে ধারনার সঙ্গে খাপ-খাওয়ায়। (সমগ্র বস্তুর) পৃথিবী সম্পর্কে একটি ধারণা আমাদের আছে কিন্তু উদাহরণ দেওয়ার

কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। 'সরল কি?' এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে (অবিভাজ্য, বিয়োজিত) কিন্তু তাকে কোনো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু দিয়ে আমরা স্পষ্ট করতে পারি না. আমরা অসীম শক্তি এবং মহানের কল্পনা করতে পারি কিন্তু এই অসীম শক্তি বা মহত্ত্বকে দৃশ্যত করার জন্য প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনা (পূর্বনির্ধারিত) শ্রমসাধ্য এবং পর্যাপ্ত নয়। ঐসকল এমনই ধারণা যা মূর্ত করা অসম্ভব, আর সেই কারণেই ঐসব ধারণা বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো বোধের জন্ম দেয় না। ফলে যে সকল শক্তি আনন্দ অনুভূতির জন্ম হয়, তার স্বাধীন সংযোগ ঘটতে বাঁধা সৃষ্টি করে। রুচির স্থায়ী চেহারা তৈরী করার পেছনে বাঁধা সৃষ্টি করে, শুধু বলা যেতে পারে: উপস্থাপনার অতীত।

আমি সেই সকল কলাকে আধুনিক বলবো যারা কিছুটা প্রযুক্তিগত মগজ খরচ করে যেমন দিদেরো বলতো: এই তথ্যকে তুলে ধরো বিমূর্ততার অস্তিত্ব আছে। মূর্ত করো এমন কিছু যাকে ধারণা করা যেতে পারে এবং যা অদৃশ্য অথবা দৃশ্যমান হতে পারে না অর্থাৎ যে কারণে আধুনিক চিত্রকলা বিপন্ন। তবে কি করা যেতে পারে? কান্টের দ্যাখানো পথটি হচ্ছে: আকারহীনতা; বিমূর্তকে মূর্ত করার সম্ভাব্য সূচি হিসেবে আকারের অনুপস্থিতি। কান্ট শূন্য বিমূর্ততার কথা বলেছেন যখন অসীমকে উপস্থাপনার সন্ধানে কল্পনা দৌড়োয়, এই বিমূর্ততা নিজেই এক ধরনের অসীমতার চিত্ররূপ এটা অসত্য। পরমকে তুলে না ধরার যে নির্দেশ সবচেয়ে মহান উক্তি হিসেবে বাইবেলে আছে তাই তিনি উচ্চারণ করেন thou shalt not make graven images (মিশরত্যাগী ইস্রাইলীয়দের দলবদ্ধভাবে প্রস্থান) মহান চিত্রাঙ্কনে. নান্দনিক দেহরেখা সৃষ্টির ব্যাপারে খুব কমই মনোযোগ দেওয়া দরকার। আর সেইজন্য চিত্রাঙ্কন নিশ্চিত অর্থেই অযৌক্তিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে এড়িয়ে চলবে যে কোনো ধরনের মূর্তিদানঅথবা কল্পমূর্তি। Malevitch এর বর্গক্ষেত্রসমূহের মতো শুভ্র হবে; শুধু এটা দেখাতেই সমর্থ করে তুলবে যে অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে, ব্যথা দিয়েই শুধু সুখের অনুভূতি ঘটাবে। এই সমস্ত নির্দেশনামার মধ্যে যে কেউ চিহ্নিত করতে পারবে আভাগার্দদের চিত্রকলার স্বয়ং প্রমানিত সত্যগুলো যেহেতু তারা দৃশ্যমান উপস্থাপনার সাহায্যে অতীন্দ্রিয়তার পরোক্ষ উল্লেখে নিজেদের উৎসর্গ করে ফেলে। যে নিয়মগুলোর কারণে কাজটিকে সমর্থন করা যাচ্ছে; সেই নিয়মগুলোই প্রবল মনোযোগ দাবী করছে কিন্তু এটাকে বৈধ করার

জন্য মহত্বের বৃত্তিগত পেশার মধ্যে শুধু নিয়মগুলো জন্মলাভ করতে পারে, অর্থাৎ গোপন করে ফেলছে। বাস্তবের অবিভাজন ছাড়াই অনির্বচনীয় থেকে যায় সেগুলো যা আসলে মহান ধারণা তত্ত্ব।

এটা আমার উদ্দেশ্য নয় আভাগার্দরা কিভাবে বাস্তবকে হতমান বা টেকনিকগুলো পরীক্ষা করে. বলা যায়, অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। বর্ণসমূহের স্থানিক সমন্বয়, অঙ্কন, রঙের মিশ্রণ, দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ ও সমান্তরাল প্রান্তবিশিষ্ট চিত্রানুপাত, যন্ত্র এবং ঠেকনোর প্রকৃতিটি বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ, প্রদর্শনী মিউজিয়াম: উপস্থাপনার কৌশলগুলো আভাগার্দরা স্থায়ীভাবে দীপ্তমান করে তুলেছে যা কিনা চিন্তাকে দৃষ্টির অধীন করে তুলেছে এবং বিমূর্ততা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি ম্যরকুজের মতো ভুল প্রতিপন্ন করার এই দায়িত্বটি হ্যবারমাস নিকৃষ্টতার একটি ধরণ হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করে যা কিনা আভাগার্দদের চরিত্রায়ন; এটা এই কারণে হবে তিনি কান্টের মহান ধারণা ফ্রয়েডের মহান ধারনাটির সঙ্গে গুলিয়ে দিয়েছেন: নন্দন তত্ত্ব তার কাছে সৌন্দর্য হিসেবেই প্রতিভাত।

উত্তর-আধুনিকতা

উত্তর-আধুনিকতা তাহলে কি? কি তার অবস্থান, এই মাথা ঝিমঝিম শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত যে প্রশ্নাবলী; ভাবমূর্তি এবং কাহিনীর নিয়মকানুনের দিকে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, উত্তরটি এর মধ্যে? না এর বাইরে? সন্দেহ নেই যে এটা আধুনিকতারই একটা অংশ। সমস্ত কিছুই যা আমরা গ্রহণ করেছি; যদি বলা হয় শুধু গতকালই (পেত্রোনিয়াস যাকে বলতো: ঠিক এখনি। সন্দেহ করতেই হবে, কোন অংশটিকে সেজান চ্যালেঞ্জ করে ইমপ্রেসনিষ্টদের? কোন বিষয়টিকে পিকাশো এবং ব্রাক্‌ আক্রমণ করে, সেজানের? ১৯১২ সালে কোন অনুমানটিকে দ্যুসঁ খণ্ডন করে? যদি কেউ চিত্রাঙ্কন করে তাকে কিউবিষ্ট হতেই হবে যে সমস্ত অনুমান টিকে ছিলো এবং যা সে বিশ্বাস করে; ব্যুরঁা বলেছেন দ্যুসঁার কাজকর্মে তা কোনোভাবেই ছোঁয়ার চেষ্টা হয়নি: কাজের উপস্থাপনার অঞ্চলটি, এক বিস্ময়কর ধরনের

মধ্যে প্রজন্ম সকল নিজেদের থিতিয়ে দিয়েছেন। একটা কাজ আধুনিক হয়ে উঠতে পারে যদি তা প্রথমে উত্তর-আধুনিক হয়। উত্তর-আধুনিকতাবাদ যা বোঝা গ্যালো শেষ পর্যন্ত তা আধুনিকতাবাদ নয়; কিন্তু জায়মান অবস্থায় এবং এই অবস্থাটি অপরিবর্তনীয়।

তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি কিছুটা যন্ত্রের মধ্যে এই শব্দটায় লেগে থাকতে রাজী নই। যদি এটা সত্যি হয় বাস্তবের অপসৃয়মানতার মধ্যে আধুনিকতার জন্ম, তবু উপস্থাপনা এবং ধারনার মধ্যকার মহান সম্পর্কের কারণেএই সম্পর্কেরমধ্যেই, এই দুই আচরণবিধিকে পার্থক্য করা সম্ভব। উপস্থাপন ক্ষমতার এই যে অক্ষমতা প্রতিটি হৃদয় অনুভব করে; সবকিছুর উপস্থাপনার জন্য যন্ত্রণা, ফলে যে অন্ধকারময় এবং অকার্যকর ঝোঁক মানুষকে ঘিরে থাকে; এদের প্রত্যেকটির উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। বরং কল্পনা করার ক্ষমতা (এ্যাপোলোনিয়ার আধুনিক শিল্পীদের কাছে যে গুণ দাবী করেছিলো) বলা যায় অমানবিকতা ধরার যে ক্ষমতা বরং তার উপরই জোর দেওয়া যেতে পারে। পরিবর্তে এটা আমাদের বোঝাবুঝির ক্ষোভ নয় সংবেদনগ্রাহিতা অথবা কল্পনা ধারণার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কি খাচ্ছে না? চিত্রসংক্রান্ত শৈল্পিক অথবা যে কোনো খেলার নতুন নিয়ম আবিষ্কারের কারণে যে আনন্দোৎসব এবং প্রাণীজগতের আবির্ভাব তার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে। যা আমার মনের মধ্যে আছে আরো সুস্পষ্ট হবে যদি আমরা ইতিহাসের চেসবোর্ডে আভাগার্দদের কিছু নাম ভাবকল্পিতরূপে সাজাই:

বিষণ্ণতা	জার্মান একস্‌প্রেসনিষ্ট		
প্যারিসের নতুন আর্ট	ব্রাক/পিকাসো		
সামনে	মেলভিচ	পেছনে	লিসস্‌কি
একদিকে	চিরিকো	অন্যদিকে	ড্যাঁ

সে অতি সূক্ষ্ম তারতম্য দুটি ধরণকে আলাদা করে দিচ্ছে অনেক বেশী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হতে পারে; একই ঘুঁটির মধ্যে প্রায়ই তারা পাশাপাশি অবস্থান করে, প্রায়ই পার্থক্য নির্ণয়ে অসাধ্য। তা সত্ত্বেও তারা এক পার্থক্যর সাক্ষ দেন যার উপর চিন্তার পরিণতি নির্ভর করে; অনুশোচনা এবং প্রচেষ্টার মধ্যেও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে।

জয়েশ এবং প্রুস্ত এর লেখালেখি এমন কিছুর উল্লেখ করে যার উপস্থাপনা অসম্ভব। অর্থালঙ্কার যার প্রতি পাওলো ফেভ্রি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো হয়তো এমন এক ধরণের প্রকাশভঙ্গি যা এ ধরণের লেখালেখির পক্ষে অপরিহার্য; নন্দন-তত্ত্বের মহান ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থালঙ্কারের জন্য মূল্যপ্রদান হিসেবে প্রুস্তকে যা কৌশলে পরিহার করতে হয়; তা হচ্ছে চেতনার অভিন্নরূপ ফলে এগিয়ে থাকার শিকার কিন্তু জয়েশের পক্ষে এটাই লেখালেখির একমাত্র পরিচয় ফলে তিনি গ্রন্থ অথবা সাহিত্যের অতিরিক্ততার শিকার। শব্দজ্ঞান এবং পদবিন্যাস অপরিবর্তিত রেখেই প্রুস্ত বিমূর্ততাকে তুলে ধরে। এমনভাবে লেখালেখি করে যা বর্ণনামূলক উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত। এই যে সাহিত্যসুলভ প্রতিষ্ঠানিকতা যা প্রুস্ত, বালজাক এবং ফ্লবেয়ারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে তা সত্য ভেবেই ভেঙে ফ্যালা হয়েছে: নায়ক আর কোনো মতেই একটি চরিত্র নয়; সময়ের অন্তর্লীন চেতনারূপ এবং এর মধ্যে কথনের ঐতিহাসিকতা যা আগেই ফ্লবেয়ার ধ্বংস করে ফেলেছে, গল্প-বলার কারণেই তা প্রশ্নের মুখোমুখি। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটির একটি সুর চেতনার মহাকাব্যিক ভ্রমণকালে যদি প্রতিটি অধ্যায়ে পাল্টে যায় কথনোই ভীষণভাবে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় না। লেখার এই নিজস্ব একরূপতা যা সীমাহীন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাক খায়; ঐক্য প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট, যা ছ ফেনোমলজি অব মাইণ্ডে এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

জয়েশ তার লেখায় বিমূর্ততাকে প্রবেশ করায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার জন্যই। সমগ্র ঐক্যের তোয়াক্কা না রেখেই সুলভ বর্ণনায় গোটা অঞ্চল এবং এমনকি শৈলী সংক্রান্ত সব রকমের ক্রিয়াকলাপকে এই খেলায় লাগিয়ে ফ্যালে ফলে নতুন নিয়মের চেষ্টা হয়। সাহিত্য-ভাষার শব্দজ্ঞান এবং ব্যাকরণ যেভাবে দেওয়া থাকে সেভাবে আর ব্যবহৃত হয় না বরং কিছুটা তত্ত্ব হিসেবে ছাপা দেয়। এবং ভক্তির কারণে শাস্ত্রীয় আচার যেভাবে জন্মলাভ করে যা বিমূর্ততাকে তুলে ধরতে বাঁধা সৃষ্টি করে, সেভাবেও।

সুতরাং এখানেই আছে পার্থক্যটি: আধুনিক নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে মহান-ধারণার তত্ত্ব যদিও বিষয় প্রকৃতির। বিমূর্ততাকে এগিয়ে ছায় শুধু এক বিলুপ্ত সারমর্ম হিসেবেই কিন্তু রূপ টিউপলব্ধ, সঙ্গতির কারণে পাঠক অথবা দর্শককে আনন্দ এবং স্বস্তির খোরাকই জোটায়। তা সত্ত্বেও এই অনুভূতিগুলি

সত্যিকারের মহান অনুভূতির জন্ম হয় না কিন্তু আনন্দ এবং যন্ত্রণার স্বতঃ মিশ্রণের মধ্যেই থাকে। আনন্দ এটাই যা বুদ্ধিকেই ছাপিয়ে যায় যন্ত্রণা এটাই কোনো কল্পনা অথবা সংবেদনশীল, ধারণাটির সমকক্ষ নয়। আধুনিকতার মধ্যে উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে তাই যা কিনা বিমূর্ততাকে মূর্ততার মধ্যে নিজেই ঠেলে দ্যায়; যা কিনা সার্বিক আকারের দাবীটাকে নিজেই মিথ্যে বলে ত্যাগ করে। অধরাকে না ধরতে পারার জন্য যে বিষন্নতা, সেটাকে সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়ার মতো রুচির ঐক্যমত বেড়ে তোলাটা সম্ভব করে তোলে। যা এক নতুন উপস্থাপনার জন্য অনুসন্ধান শুরু করতে সাহায্য করে। তা শুধু সেগুলো উপভোগ করার জন্য নয় বরং একটি উপস্থাপনার এক শক্তিশালী বোধের জন্ম দেওয়ার জন্য ফলে একজন উত্তর আধুনিক শিল্পী অথবা লেখক একজন দার্শনিক পর্যায়ে উন্নীত: যে টেক্সটা সে রচনা করে; যে কাজকর্মের সে জন্মদান করে পূর্বনির্ধারিত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত নয়। পরিচিত ফর্ম ব্যবহার করে সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট অবধারনের সাহায্যে বিচার করা যেতে পারে না। ঐ সকল নিয়ম এবং আকারগুলো হচ্ছে তাই শিল্প কর্মটি নিজেই যার অনুসন্ধান চালায়। শিল্পী এবং লেখক তখন নিয়ম ছাড়াই কাজ কর্ম করে এবং তা নিয়ম নির্ধারনের জন্য যা পরে অনুসরন করা হবে ফলে তথ্য হচ্ছে; এই কাজ এবং টেক্সট একটি ঘটনার চরিত্ররাজি ফলে লেখকের জন্য সেগুলো বড়ো ধীরগতিতে এসে পড়ে অথব যা একই বস্তু, তাদের অস্তিত্বটি কাজের মধ্যে রাখা হয় এবং তাদের উপলব্ধি খুব দেরীতেই শুরু হয়। ভবিষ্যতের প্রহেলিকা অনুযায়ীই উত্তর আধুনিকতা তাই বুঝতে হবে।

আমার মনে হয় মাতিয়ের রচনাগুলো উত্তর আধুনিক, অসম্পূর্ণ অংশটি আধুনিক।

শেষপর্যন্ত বলা যায়; এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার বাস্তবের চিত্রগুলো ধরা আমাদের কাজ নয় কিন্তু ধারণার এক পরোক্ষ উল্লেখের আবিষ্কার আমাদের লক্ষ্য যা উপস্থাপনা করা যেতে পারে না। এবং এটা আশা করা যায় না যে এই দায়িত্বটি ভাষা চর্চা শেষ-সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবে। এবং শুধু অতীন্দ্রিয় আভাসটি (যা হেগেলীয়) এক বাস্তব ঐক্যের মধ্যে সেগুলো সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে কিন্তু কান্ট জেনেছিলো এ ধরণের মোহের জন্য মূল্য দেওয়া আতঙ্কের স্বরূপ। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী আমাদের এতোটাই আতঙ্ক

দিয়েছে যতোটা আমরা সহ্য করতে পারি। এক এবং অদ্বিতীয়তার জন্য আকুলতা, তার প্রতি আমরা যথেষ্ট মূল্য দিয়েছি। ধারণা এবং সংবেদনের মধ্যে, স্বচ্ছতা এবং যোগাযোগ মূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয়ের জন্য যথেষ্ট মূল্য আমরা দিয়েছি। গাছাড়া ভাব এবং প্রশান্তির জন্য যে সাধারণ দাবী তার মধ্যে শুনতে পাই আতঙ্কের প্রতি আমাদের আগ্রহের কথা। বাস্তবকে ধরার জন্য অলীকত্বকে উপলব্ধ করা। উত্তর একটাই; আসুন আমরা সম্পূর্ণতার পরিপেক্ষিতেই যুদ্ধ ঘোষনা করি; আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক অবস্থার পার্থক্যকে অনুধাবন করি এবং ঐ নামের সম্মান রক্ষার চেষ্টায় সচেষ্ট হই।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

শূন্যস্থানের পরে ঃ আরম্ভের আগে, যেখানে ঘটনার পিছনদিক

এই লেখার প্রথম পাঠে আমরা এই যে রচনাংশ রাখছি তার মূল ভিত্তি আরেকটি গল্পের শুরু। আমরা সেখানে একটি কিশোরীর আত্মহননের সংবাদ ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু কেবল সংবাদ সেখানে আসেনি, রাখিনি কেননা রাখা যায়নি, গল্পের দাবীতেই যায়নি; ফলে পাঠক কাকে ফিকশন বলেন তার অবতারণা সেখানেই হয়ে যায়। বলা চলে হয়ত আমরা সেখানেই গল্পের যে এবড়োখেবড়ো কাঠামো, যা বাস্তবতা, তা থেকে শিল্পের কারণেই, দূরে সরে গেছি এবং সেখান থেকেই গল্পের শুরু, ঘটনার শেষ। কিন্তু বর্তমান লেখাকে আমরা আরম্ভেই পাঠকের সামনে রাখছি আরেকটি কিশোরীর জবানবন্দী, যে কিশোরী আমাদের প্রথম রচনার পাঠক এবং বর্তমান লেখাটি যিনি পড়েছেন, দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, ঐ মেয়েটি কিভাবে আমাদের এই রচনার অংশ হয়ে উঠছে। ঐ হয়ে ওঠার মধ্যে কোন শিল্প না থাকলেও এখানে আমরা লক্ষ্য করবো কিভাবে মেয়েটি, একটি জলজ্যান্ত কিশোরী, তার বাস্তবতা ও অভিযোগ নিয়ে রহস্যময়ভাবে মিশে থাকে আমরা যা কল্পনাও করিনি সেই রকম কোন বৃত্তান্তের শরীরে। অর্থাৎ, এখানে আমরা দেখবো কিভাবে একজন পাঠক হয়ে ওঠেন রচনার বিষয়, বা একটি রচনা, নিজেই।

"অবশ্যই এখানে বলে রাখা দরকার যে, আপনার গল্পের সমালোচনা বা আলোচনা, কোনটাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আপনি তথাকথিত লেখকদের মতো লিখে দেননি, "এই গল্পের সমস্ত চরিত্রই লেখকের···" তাই এ অধমের এই পত্রাঘাতের ধৃষ্টতা।" যে চিঠি থেকে বর্তমান অংশ আমরা তুলে

নিয়েছি তা থেকেই আমাদের লেখার দ্বিতীয় বা সব থেকে মূল্যবান পয়েন্টটি আমাদের সামনে উঠে আসতে আমরা দেখবো। প্রথমত চিঠিটি যেটা পরিষ্কার করতে পারে তা হলো, ঠিক কোন বিন্দুতে পাঠক এবং আমাদের রচনার মেয়েটি একাকার হয়ে গেল। আসলে ব্যাপারটি হলো তা হলে ইনি, বর্তমান পাঠিকা, ইনি কোন এক জায়গায় রচনায় উল্লেখিত মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে, নিজের অবস্থা ও অবস্থানকে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। আর পাশাপাশি জন্ম নিতে থাকে ফিকশান-বিষয়ক আরো একটি প্রশ্ন, যা এইরকম যে, তাহলে কি এখান থেকেই শুরু হচ্ছে না আরো একটি নতুন অংশ যা এই লেখক ব্যক্তিগতভাবে তৈরী করছে না এবং করছে। করছে কারণ সে মেয়েটিকে চেনে না, করছে না কারণ মেয়েটি তার চিঠিতে ততোখানিই পরিষ্কার যার পর থেকে এই লেখকের পক্ষে কল্পনার একটা খোলা সুযোগ রয়ে যায়। এবং এতে কি এরকমও হয় না যে, মনে হতে পারে বাস্তবতার এক পুনর্গঠন এখানে শুরু হলো, যার রাশ একই সঙ্গে পাঠক এবং লেখক উভয়েরই হাতে!

রচনার সুবিধার্থে আমরা বিগত লেখায় আমাদের চরিত্রের নাম রেখেছিলাম 'ক' যে অক্ষরটি একটি ব্যাপ্তির প্রতীক-মাত্র, কোন সীমিত পরিচিতি নয়। কিন্তু বর্তমান লেখায় যদিও আমাদের পত্রলেখিকা মেয়েটি নিজেকে 'ক' নামেই অভিহিত করেছে তবু আমরা এই মেয়েটির একটি নাম কল্পনা করে নেব—যা, এমনকি, 'কল্পনা'ও হতে পারে। এবং এবার আমরা কল্পনার জীবনচরিতে প্রবেশ করবো যা কখনোই মানুষ-কল্পনার সঙ্গে মিলবে না, বা মিললেও মিলবে কেবলমাত্র কাঠামোর দিক থেকে।

একজন মেয়ে, যে কিনা কল্পনা, কিংবা

১.

কল্পনা-বিষয়ে যে ক'টা বিষয় আমরা জানতে পেরেছি তাকে এক দুই করে সাজালে ব্যাপারটা দাঁড়ায় মোটামুটি এই রকম যে, ১. মেয়েটির বাস আমাদের কলকাতা শহরে, ২. মেয়েটির বাবা কোন প্রাইভেট ফার্মের বি গ্রেড অফিসার ছিলেন কিন্তু এখন আপাতত সবেতন ছুটিতে আছেন, ৩. মেয়েটি ছেলেদের গোপন কামনার ইঙ্গিত পেয়েছে এবং পেয়ে বিব্রত হয়েছে, ৪. সে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, ৫. মেয়েটি আবারও আত্মহত্যার

চেষ্টা করতে পারে এবং এবার সে ব্যর্থ না-ও হতে পারে বলে তার ধারণা, এবার সর্বশেষ বা ৬. হলো যে সে, আমাদের 'ক'-র মতোই, কাল্পনিক কাউকে চিঠি লেখে, যার নাম ধরা যাক 'জ'। আমরা এই ক'টি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করেই এখন একজন কল্পনাকে গড়ে নেব।

২. ১

গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়, বলা যায়, এমনিই। বা এমনো হতে পারে যে, তার মনে, কল্পনার, এটাই ছিলো এবং না-জেনেসে একেলালন করে এসেছে, যেভাবে অন্য অনেকে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হবার আকাংখাকে লালন করে, যাকে আমরা বলে থাকি 'স্বপ্ন'। কিন্তু কথাটা হলো, এই যে শেষ বিকেলে কল্পনা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো, এই স্রেফ দাঁড়ানোটুকু, দাঁড়িয়ে থাকাটুকু, এটা তার মনে হলো, আহা, অকারণ। আর ঐ 'অকারণ' শব্দটি যেভাবে, সূর্যাস্তের ঠিক অব্যবহিত আগেই, কে যেন বলেছিল, সূর্য আকস্মিক, যেন-লাফ-দেবার-আগেকার-নিঃশ্বাস-বন্ধ-উঠে-দাঁড়ানো-এটা এভাবেই একটু, খুব সামান্য, উঠে আসে এবং পর সেকেণ্ডেই কি চমৎকার অন্ধকার, হ্যাঁ অন্ধকারে হারিয়ে যায়, তেমনই গ্যালো। গ্যালো যে কল্পনা দেখলোও এটা। দেখে সামান্য হাসলো। দেখলো আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। ছায়া, উল্টো। আর সেই মুহূর্তে, যখন মাথা চাড়া দেবার মতন কোন কবিতার পর্যন্ত অস্তিত্ব নেই সে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছিলো তাকে, কাকে বলা কঠিন হতে পারে মনে হতে পারে যে বুঝি অন্ধকার। বুঝি বা অন্ধকার আর আলোর সীমানায় লম্বমান কোন দৃশ্যমাত্র, যাকে হাতে নয় কেবল মনে মনেই ধরা যেতে পারে, আঁকড়ে। ফের তাকালো আয়নার দিকে। দেখলো অতীব সাদা তার দাঁতগুলো, হাসিটা, একাকার হতে গিয়েও পারলো না অন্য সব কিছুর সঙ্গে। আর কি অদ্ভুত, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল কি এইমাত্র। না কি অনেকক্ষণ থেকেই ছেলেবেলার মধ্যে, সেই উদ্‌ভ্রান্ত রোদের রেশমি ঝাঁজের ভেতর ধীরে গলে মিশে গেছিলো সে, যে মিশে যাওয়া এইমাত্র শরীর নিয়ে হেসে উঠলো উল্টো-দিকের ছায়ার মধ্যে। সে ভাবতে চাইছিলো, তাকে যার নাম ইন্দ্র, হয়ত বা ইন্দ্রনীল, সে জানে না। জানে না কারণ কেবল দেখা, বার বার দেখা, আর কয়েকটুকরো আবছা শব্দ একতরফাই তো ছিলো, যার ভেতর, না, এবাদে আর কোন নাম নেই। আর তার সঙ্গে মিলে মিশে

উঠে কি আসছিলো না আরো একজন কেউ, যার প্রতিটা মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্দাম হয়ে ওঠা চেনে সে, চিনেছে চিনতে বাধ্য হয়েছে বলেই।

সরে এলো সে। সরে এলো এবং টের পেলো পায়ের নিচে মেঝের ঠাণ্ডা হয়ে ওঠা। ঘরের বাইরে বেরুতেই লাফ দেয়া ঐ এক মরা আলো, হলুদ, আঁচড়ে দিলো তার চোখ। টের পেলো ফের এক চেনা প্রিয় অনন্ত ছেলেবেলার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে যে, মনে পড়লো একটি কণ্ঠস্বর, মনে পড়লো সেই উৎকণ্ঠ পুরুষ-শরীর যার আঙুল ধরে ধরে একটি ছোট্ট, ছোট্ট, মেয়ে ধীরে হাঁটতে শিখছে। ঠোঁটে নোনা স্বাদ পেতে একটু চমকে উঠলো কি। চমকে উঠলো কি আকস্মিক আবিষ্কারে যে, এতোক্ষণ এই হলুদ মরা আলোয় সে, দুই ঠোঁট, জিভ এতোক্ষণ কেবল ফিসফিস করে চলেছে 'বাবা-বাবা-বাবা-বাবা……'

জ্ঞান হারিয়ে বাথরুমে লুটিয়ে পড়ার আগে কেবল একবারই তার মনে হলো এই তৃতীয়বার···তৃতীয়বারের মতো···সে টের পেলো তার মুখ খুলে যাচ্ছে, আর কোথা থেকে, সে কোনো উৎসমুখ যেন, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তো পড়ছেই···পড়তেই থাকলো···

৩. কল্পনা নামে যে মেয়েটিকে আমরা তৈরী করেছিলাম উপরের অংশে তাকে রক্তমাংস দিতে গিয়ে একটা সমস্যার আমরা মুখোমুখি হয়েছি। দেখা যাচ্ছে মেয়েটি এবারেও সেই ব্যর্থই হচ্ছে এবং তাহলে চতুর্থবারের এবং প্রায় অনন্তবারের জন্য তার সামনে আত্মহননের একটা পথ খোলাই পড়ে থাকলো। কিন্তু কথাটা হলো, আমরা এখনো জানি না এবং হয়ত জানতেও পারবো না আমাদের কল্পনার মেয়েটি সত্যিই বেঁচে গিয়েছিল, নাকি যায় নি। ফলত এখন সমস্যাটি হলো: **মেয়েটি কি করতে পারতো** এবং কথাটা এই যে, এই লেখায় আমরা তা জানতেও পারবো না।

আরো একটি তৈরী করা অংশ, যা হতে পারতো

১. লেখার সব থেকে মূল্যবান এই বিন্দুতে এসে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের কল্পিত মেয়েটির সমস্যার কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পর্যন্ত পারলাম না অথচ দেখা যাচ্ছে মেয়েটির একটি সামান্য আদল কিন্তু পাওয়া গেল। বাস্তব-অবাস্তব সবকিছু গুলিয়ে যাবার পর ফের একটি পুনর্গঠনের প্রশ্ন থাকেই, কেননা যতক্ষণ এই লেখা চলবে ততক্ষণ আশা তো ছাড়া যায় না যে, আমরা পারলেও

পারতে পারি তাকে, ঐ মেয়েটিকে, স্পর্শ করতে। সেই সম্ভাবনাটুকু কি থেকেই যায় না যেখান থেকে এই রচনার ব্যর্থতাই হয়ে উঠতে পারে অন্য রচনার প্রারম্ভত বিন্দু।

২. লেখার এই অংশে একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

ক. ☐ পাঠক হিসাবে আপনার কাছে মূল প্রশ্নটি কি যা থেকে আপনি এই লেখাটি আরম্ভ করছেন? আপনার কি কোন প্রত্যাশা আছে এ 'লেখার' হয়ে ওঠা বিষয়ে—

খ. ☐ নিশ্চয় আছে। আমি এতোক্ষণ আশা করেছি মেয়েটিকে আমি বুঝতে পারবো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে লেখক তাকে বোঝা দূরস্থান তার অবস্থান-বিন্দুটাকেই ধরতে পারছেন না।

ক. ☐ প্রশ্নটা কি, যা থেকে—

খ. ☐ দেখুন, পরিষ্কার কথাটা হলো আপনার কাছে মেয়েটির পরিচয়টা কি? সে কে? কেন আপনি তাকে বেছে নিলেন বিষয় হিসেবে? মূল লেখার এই দ্বিতীয় পর্বের জরুরীতাই বা কি?

ক. ☐ আসলে দেখুন, আমরা বুঝতে চাইছি, মেয়েটিকে এবং যেটা লেখক-পাঠকের মিলিত প্রচেষ্টায় একমাত্র সম্ভব। মেয়েটি কোথাও নেই, সে আছে কেবল উভয়ের রিঅ্যাকসনের মধ্যে। ঐ যে রিঅ্যাকসন ওটাই আসলে গল্প, যেটা লেখা হয় না, মূল লেখার মধ্যেকার যে প্রাণবন্ত মেয়েটিকে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছিলো আমি তো বলব সেটাই আসল কারণ যেখান থেকে এই অংশের জরুরীতা উঠে আসছে। আর মেয়েটির পরিচয়? সে তো আপনার প্রশ্নের মধ্যেই রয়ে গেছে। মেয়েটি হলো আপনার কৌতূহল, যা আপনাকে আপনার বিষয়ে ভাবাতে আরম্ভ করেছে।

খ. ☐ বুঝলাম না। দেখুন—

মানে, আমি বলতে চাইছি আপনি মশাই নিজেকে নিয়েই ভাবছেন। মানুষ এটাই করে। সে অন্যের ভালো চায় নিজের ভালোর জন্যেই। এটা কিন্তু স্বার্থপরতা নয়

খ. ☐ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মানে,—আপনার 'ক' এবং ঐ কল্পনা মেয়েটি এ দুটোর যোগটা কোথায়। কেন আপনি ইয়ে-কের এতো লিখছেন—লেখার জাস্টিফিকেশনটা কি—

ক. ☐ ধরুন যদি বলি, আমিও আমাকে বুঝতে চাইছি—

খ. ☐ এতে কি আপনি কল্পনার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন? কোন সাহায্য করতে পারবেন?

ক. ☐ মানে, পথ দেখাবার কথা বলছেন, তো? না দাদা, পথ দেখাবার মালিক আমি নই। আমি আপনারই মতো একজন লোক, যে পথ দেখাতে পারে না, কিন্তু সমস্যাটা বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারে। হওয়াতেও পারে। কে বলবে তা থেকেই পথটা বেরিয়ে আসবে না?

খ. ☐ যাকগে, কিন্তু আপনি তো মশাই গল্প লিখতে বসেছেন। আগের অংশে যে শূন্যস্থানটা রেখেছিলেন সেটাকে—

ক. ☐ সেটাকে ভরাতে বসেছি ভাবছেন নাকি? না ভাই, তা কিন্তু নয়। এই লেখাটা শূন্যস্থাণের পর থেকে বদলেই গেছে—এটা আর আমার গল্প নয় বরং ঐ মেয়েটির গল্প যা কিনা যতো সময় যাচ্ছে আমাকে সচেতন করে তুলছে ওর সমস্যা বিষয়ে এবং সাইমাল-টেনাসলি সচেতন করছে আমার এই অক্ষমতা বিষয়ে যে, এ' গল্পও আর শেষ হবে না—চলতেই থাকবে—

খ. ☐ তাহলে—

ক. ☐ না, আমি নিছক গল্প, বা এমন কি কোনরকম রিপোর্ট লিখতেও বসি নি। আমি কেবল ভাবতে চাইছি এবং এই 'রচনা'য় হয়ে ওঠা-কে অনুসরণ করছি।

খ. ☐ কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই লেখার আগের অংশের বিষয়টা—

ক. ☐ ওখানেও আমি দেখালাম লেখাটা যদি আমাকে 'লিখতে' হয় তাহলে আমি কতোটা ব্যর্থ হবো। আমার ভাষা পদ্ধতির কৃত্রিমতা আপনাকে তো বটেই আমাকেও বিরক্ত করবে এবং কথাটা হচ্ছে, এখানেই আমি একটা সুযোগ নিচ্ছি—

খ. ☐ উঁ—

ক. ☐ সুযোগ নিচ্ছি আপনার মুখোমুখি হয়ে আপনাকে বিরক্ত করে আরো একটা ক্ষেত্রে আপনাকে তাতিয়ে তুলতে। আচ্ছা, বলুন তো—মেয়েটির তৃতীয়বার আত্মহত্যার যে প্রচেষ্টা তা কি সফল হবার ভয়ই আপনি পান নি?

খ. ☐ পেয়েছিলাম—

ক. ☐ এবং সেটা ঠেকাতেও চেয়েছিলেন—

খ. ☐ হ্যাঁ, তা—

ক. ☐ ঠিক। এবং কেন তার আত্মহত্যা অনুচিত তা নিয়েও আপনার

চিন্তায় কারণ তৈরী হচ্ছিলো—ওয়েল, আমার কথা হচ্ছে, এবার আপনি আসুন গল্পটা লিখতে, আপনি বলুন কিভাবে কল্পনার বাঁচার, তার সব স্বপ্ন নিয়ে বাঁচার ব্যাপারটা সম্ভব—আমি কাজটা আরম্ভ করে দিয়েছি, এবারকার কাজ তো আপনার

[দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের এটুকুই আপাতত ছাপা হলো]

কল্পনা নামের মেয়েটি, যে লেখককে চিঠি লিখেছিলো, সে এখন বিরক্ত হয়ে উঠছে

'জানি না আপনাকে সব কথা বলতে পারলাম কিনা জানি না আর কতদিন বেঁচে থাকতে হবে, আর জানি না কতদিন আপনাদের বোকা-বোকা তদন্তমূলক-সমীক্ষা গিলতে হবে—"লিখেছিলাম আপনাকে, যতদূর মনে পড়ছে। আর এখন দেখছি যা লিখছেন আপনি বা আপনারা সেটা বাস্তব থেকে আরো দূরে সরে যেতে যেতে···সে যাক, আপনাদের, মানে, ইন্টেলেকচুয়ালদের এটাই ধরণ, মানে এই সরে যাওয়াটা। আপনারা বাস্তবতাকে ভয় পান। ভয় পান কারণ বাস্তবতা আপনাদের তত্তকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে ছায়। যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি সব নিয়েও এই আমার মতো একটা মেয়ের সমস্যাটা বোঝার ক্ষমতা আপনাদের হয় না দেখে মজা, হ্যাঁ, মজাই পাচ্ছি। মজা পাচ্ছি আপনাদের কল্পনার অগভীরতা দেখেও। মনে রাখবেন যাকে আপনি এই আমার চিঠির অংশ থেকে খাড়া করেছেন সেটা আমি তো নই-ই, আমার মতো আর কেউও নয়। প্রিয় লেখক আমি আশা করেছিলাম যে সত্যিই আপনার লেখায় আমার মতো একটা মেয়ের অনুভূতি রূপ পাবে। ভুল করেছিলাম। কারণ, বুঝতে চেষ্টা করুন যে, আপনারা আমার সাধারণ ঐ চিঠিটি, যেটি বলেছিলাম কাল্পনিক, সেটিকে পর্যন্ত ব্যবহার করার ক্ষমতা ধরেন না। বানানো আধো-আধো বিপ্লবের বুলি আর একটা মেয়ে, যে আপনাদের এই মেট্রোপলিটন নরকে বড়ো হয়ে উঠল, যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, পারছে না, তার মধ্যে কতো পার্থক্য এখনো বোঝার মতো অবস্থায় তো আসেননি আপনারা। সেদিন আসবেন—

এই গল্পটি, যা কিনা, লক্ষ্য করুন, ফেটে গেল, ব্যর্থতায় আর

ক. ☐ আমি তো স্বীকার করছি মশাই আমি ব্যর্থ। ব্যর্থ কারণ এই মেয়েটির চরিত্র ফুটিয়ে তোলার মতো ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এখন কথাটা হলো,

একটা বোধহয় সিচুয়েশন এখানে তৈরী হয়েছে যার ভেতর আপনার সঙ্গে কল্পনার কথাবার্তা শুরু হতে পারে। আমার ব্যর্থতাই এর জন্ম দিলো। আর উল্টোদিকে, আরো একটা প্রশ্ন কি উঠলো না যে—কাকে বলে সাহিত্যের বাস্তবতা। ফটোগ্রাফিক রিয়ালিজম থেকে অনেক দূরে হয়ত যাওয়া যাচ্ছে না, তবু···

খ. ☐ কচকচানি রেখে বলুন তো ভাই,

ক. ☐ কি

খ. ☐ গল্প কি। গল্প কোনটা।

ক. ☐ জানি না।

এবং এইখানে আবার পত্র লেখিকা মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তার হাতে একটি কলম। একটা বড়ো কাগজ সে ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে যাতে লেখা—

"আমাদের গল্প আমাদেরই গল্প। আমরা আর কোন গল্পকার চাই না। মিডলম্যান চাই না"

ঐ শেষ 'না' অক্ষরটি ধীরে ধীরে বড় হতে

হতে

হতে

হতে

মৌসুমী মাম্মা

পাঁচী পাঁচছাগলের মা

to my mother the daughter of her mother of the daughter of her mother of a daughter of her to my daughter the mother of the daughter of my mother of my daughter of a mother of me to me the daughter of a mother for a daughter of the mother of a daugnter.

এক

ওলো ও পাঁচী শুনছিস ?

কি মা ? কি শুনবো মা ?

অথর্ব ঐ বেদের কথা—

কি বোলছে মা ?

বোলছে 'কন্যা জন্ম নিক অন্য কোথাও, এখানে শুধু পুত্র দাও।'

এরকম ক্যানো বোলছে মা ?

তা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেটা বুঝিয়ে ও দিচ্ছে—

সখা হি জায়া কৃপণ হি দুহিতা জ্যোতি হি পুএঃ পরমেব্যোমন্।

কিন্তু ক্যানো মা, মেয়ে সন্তানের ওপর এ্যাতো রাগ ক্যানো ?

মেয়ে মানুষ যে বড্ডো খারাপ। মেয়ে নাতো মাল। সামলে সুমলে বেঁধে ছেঁদে না রেখেছো তো—

তো কি মা ?

এই গ্যালো গ্যালো পালালো পালালো এই বুঝি পা পিছলে গ্যালো এই পোড়লো পোড়লো পোড়েছে—ধপাস্

কি মা ?

পতিতা নারী।

হা হা হা হা এইবার বুঝেছি। মনু কি তাই সাধে বোলেছে,—

শয্যাসনমলংকারং কাম ক্রোধমনার্জসম্।

দ্রোহভাবং কুচর্যা চ স্ত্রীভ্যো ? মনুরে কল্পয়ৎ।

হা হা হা হা। আরে সেই খারটা তো নীৎসের ও ছিলো। 'her great art is lie, her highest concern is mere appearance and beauty……one needs to study her behaviour with children…" হা হা হা হা। তবে Lou Salome শিষ্যা cum শয্যা-সঙ্গিনী হোতে রাজী হোয়ে গেলে ভদ্রলোক হয়তো এই কথাগুলোই একটু ঘুরিয়ে বোলতেন। কি বলো মা ?

দুই

হি হি হি হি…ধোরতে পারে না…পারে না…আমায় ধোরতে পারে না।

হ্যাগো বাছা, ভালোমানুষের মেয়ে, ধোরবো ধোরবো। যখন ধোরবো তখন টেরটি পাবে। আরে বাছা তুমি মেয়েমানুষ বারোহাত শাড়িতে কাছা আঁটতে পারবেনি, সেই যে, কথা আছে শুনছো নি না—

কি কথা ?

সেই—

জাম্বাল পুরের রাস্তা লম্বা
ডাকছে গোরু হাম্বা হাম্বা
লাচছে কেতো ম্যান্‌কা রম্ভা
মাচায় বোসে মুখ তোম্বা
অম্বা অম্বা জগদম্বা—জয় মা মাগো।

কিন্তু তবু তুমি আমায় ধোরতে পারবে না, কিছুতেই না।
আচ্ছা, ধরো যোদি ধোরি, ধোরেই ফেলি? খুব আলতো কোরে 'আমার ছোট্ট সোনাটা আমার বুলবুলিটা শক্ত দুটো ডানা দিয়ে তোমাকে আমি ঢেকে রাখবো, তুমি ঘুমোও।
ইল্লি আর কি।

ভোরব্যালার কমোলো রোদে তোমার চোখ দুটো ঝ্যানো আপেলের মতো গোল গোল গোলাপী গোলাপী তোমার চোখের পিঁচুটিতে বর্ণালীর বর্ণছটা ঝ্যানো পাকা টমেটোটা ভুস কোরে ফেটে চারিদিকে বিচি ছোড়িয়ে পোড়েছে আর··
যাঃ তুমি কি ভ্যাদভেদে রোমান্টিক গো। Hey guy be sport!

কি তুমি আমাকে ইস্‌পোর্ট হ্যাকাচ্ছো? চার বচ্ছর ফাস্ট ডিবিসনে আমি কড়াৎ কৎ মড়াৎ মৎ তারপরে সেই কি হোলো জানো সেসব কি বোলবো তুমি মেয়েছেলে বুঝতে পারবে না তবে অতই যদি তোমার শরীরের ক্ষিদে ছিলো আমাকে অ্যাকবার মুখ ফুটে বোল্লেই হোতো নরম নরম বিকেল ব্যালায় ফুরফুরে হাওয়ায় জলের ধারে তোমার হাত ধোরে আমি ও কি বোসে থাকতে পারতুম না নাকি আমার ইচ্ছে করেনা অ্যাঁ? তুমি বজ্জাত মাগী রোজ রোজ দুবগলে দুটো সোমথ সুপুরুষ নিয়ে ঘুরে ব্যাড়াবে আমার বুঝি চোখ টাটায় না অ্যাঁ অ্যা অ্যা অ্যা অ্যা—
আহা কাঁদেনা কাঁদেনা কাঁদেনা

তিন

আহা খুব কি কষ্ট হোচ্ছে তোর পাঁচী? কষ্ট করো মা আর একটু কষ্ট করো এই তো ক্যামোন ফুটফুটে খোকা হবে তোর কষ্ট করো মা আর একটু—

এই কষ্ট করার যাদুকাঠি আমার কপালে বুলিয়ে দিয়েছিলে কোন বিধাতা? তোমরা বিশ্বাস করো কষ্ট কোরতে আমি একটুও ভালবাসিনা। কষ্ট কোরতে আমার রাগ হয়, দুঃখ হয়, ঘেন্না হয়—আনন্দ হয় না। দিস মিথ অ্যাবউট ফীমেইল ম্যাকিজম···ইয়েস, ইট ইজ অ্যা মিথ।

এই myth-এর জন্ম কি প্রসবের যন্ত্রণায় ছটফট কোরতে থাকা female species-এর দিকে তাকিয়ে থাকা অবাক ভীত সন্ত্রস্ত এবং ক্রমশঃ হোয়ে ওঠা দার্শনিক দৃষ্টি? মাতৃত্বের ল্যাংটো গায়ে এই রঙীন সম্মানের আঁচল জড়ালো কে? সেকি কোনো সুদূর অতীতের মাতৃতন্ত্রের উত্তরাধিকার —নাকি মুনাফা ও ব্যক্তিসম্পদের গোপন ষড়যন্ত্র, যার প্রয়োজন ছিলো উৎপাদন (production) এবং প্রজনন (reproduction)—এই দুয়েরই ওপর নিরঙ্কুশ সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ?

কবে থেকে আমাদের পাঁচী হোয়ে উঠলো জরায়ুসর্বস্ব-প্রজননের স্বেচ্ছা শ্রমিক, যে শুধুমাত্র ভাত কাপড়ের বিনিময়ে যুগ যুগ ধোরে বিইয়ে যাবে উৎপাদন যন্ত্র টিঁকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক? হ্যাঁগো তোমরা জ্ঞানীগুণী সমাজতত্ত্ববাদীরা এই কথাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো না।

সমাজতাত্ত্বিক বোললেন প্রজনন নিয়ে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ প্রজনন একটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া (natural activity), সামাজিক ক্রিয়া (social activity) নয়। আর তাই নারী, যার এ্যাকমাত্র উপযোগিতা গর্ভধারনে শী ইজ অ্যা পার্ট অব নেচার

বলি হ্যাঁগো শুধু কি ব্যাটা বিয়োনোই প্রাকৃতিক ক্রিয়া, আর খাওয়া হাগা মোতা নয়? তবে এ্যাকটা biological necessity খাদ্যের প্রয়োজন (need to eat) যখোন হোয়ে ওঠে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি—আমরা শোষণের সংজ্ঞা শিখি—productive labour সম্বন্ধে উপলব্ধি আমাদের সমাজ চেতনাকে নোতুনভাবে সৃষ্টি করে, তখোন অ্যারেকটা biological necessity অর্থাৎ প্রজনন এবং reproductive labour নিয়ে তোমরা চুপ ক্যানো? 'মা' হওয়ার পারিশ্রমিক দিতে পুঁজিপতির ব্যক্তি মুনাফায় টান পোড়বে বোলে নাকি প্রজনন যে আসলে এ্যাকটা social necessity ও বটে, সেটা স্বীকার কোরলে তোমাদের ভাবের ঘরে চুরিটা ধরা পোড়ে যাবে? আর আশ্চর্য, তখোন Stalin থেকে Roosevelt বা Kaiser Wilhem (II)-র গলার সুরে কোনো তফাৎ থাকে না, যখন সবকটা মাদী মানুষকে আঁতুড় আর রান্নাঘরের সীতা গণ্ডীতে বন্ধ থাকার মহান কর্তব্যের কথা মোনে কোরিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁগো, কি বলো তোমরা?

চার

পাঁচী অবশ্য আজকাল অন্য কথা বোলছে। কারণ আজকে নারীপুরুষ উভয়েরই প্রজনন চেতনা (reproductive concioness) অনেক বদলে গ্যাছে। কারণ—

(১) Contraceptive-এর আবিষ্কার, ফলে আজ পাঁচীর হাতে বেছে নেওয়ার সুযোগ এসে গ্যাছে সে মা হবে কি হবে না। মাতৃত্ব আর পাঁচীর natural destiny নয়।

(২) Artificial reproduction-এর সম্ভাব্যতা। ফলে আজ আর যৌনতা ও প্রজনন সমার্থক নয়। আজ শুধুমাত্র প্রজননবিহীন যৌনক্রিয়াই নয়, যৌনসংসর্গবিহীন প্রজনন ও সম্ভব।

তাই আজকে একটা ভুল সংশোধনের কথা পাঁচী বোলতে চায়। De Beauvoir, Firestone বা Millett-এর মতো প্রথমদিকের নারীবাদীদের ভুল। কিসেই ভুল?

যে, মাতৃত্বই নারীর প্রধান বন্ধন। আর তাই, নারীমুক্তির অন্য নাম মা না হওয়া।

তাদের এরকম ভাবার পিছনে অবশ্য বহু যুক্তি ছিলো, আছে। যেমন—

(৩) এটা ঠিক যে গর্ভধারন, প্রসব ও সন্তান পালন মায়ের অনেকটা সময় দখল কোরে নেয়। বার বার মা হোচ্ছে যে নারী, সে তথাকথিত productive activity-তে দক্ষতা অর্জনের জন্য অনেক কম সময় ব্যয় কোরতে পারে, অন্ততঃ পুরুষের তুলনায়। লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এটাই।

(২) Leibowitz প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদরা অনেকে মোনে করেন নারীর দৈহিক ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় কম হওয়ার কারণ সেই আদিম কাল থেকে ক্রমাগত সন্তানধারনের ফলে নারীর শারিরীক বিকাশ ব্যহত হওয়া। এক জায়গায় খাবার ফুরিয়ে গেলে কিশোর যুবক সহজেই দূরে দূরে খাবার খুঁজতে যেতে পারতো। কিন্তু কিশোরী প্রসূতির পক্ষে ভারী শরীর নিয়ে অসুবিধা হোতো, তার দরকার ছিলো বাড়তি খাবারের, নিজের জন্য, গর্ভজাত ভ্রূণের জন্য, আর ছিলো শাবককে খাদ্য জোগোনোর বাড়তি দায়িত্ব—যা প্রায় সব প্রজাতির female species-রাই কোরে থাকে। অথচ খাদ্য আহরণ করা তার কাছে ছিলো অনেক বেশী কঠিন।

(৩) অন্যান্য প্রজাতির শাবকদের তুলনায় মানবশিশু অনেক বেশীদিন পর্যন্ত মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে, মা-র সময় ও পরিশ্রম দাবী করে।

তাই হয়ত আপাতদৃষ্টিতে মোনে হয় মা হওয়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেই নারী তার গুণ ও দক্ষতা বিকাশের অনেক বেশী সুযোগ পাবে। প্রজননের

ধারা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব তুলে দেওয়া যেতে পারে medical technology আর রাষ্ট্র পরিচালিত শিশুপালন ব্যবস্থার ওপর। কোনো মেয়ে ব্যক্তিগত ভাবে মা না হোতে চাইতেই পারে—সেটা তার নিজস্ব বিচার। তবে De Beauvoir, Firestone বা Millett রা যে দিকটা এড়িয়ে গিয়েছেন, যেটা পরবর্তীকালে অন্য অনেকে, যেমন Rowbothan, O'Brien বা Jeffery রা ভেবেছেন, পাঁচী সেই কথাটাই একটু বোলতে চায়।

মাতৃত্ব শুধুমাত্র বন্ধন নয়, মাতৃত্ব নারীর অ্যাক ক্ষমতাও বটে। IT'S a biological power which only the women possess.

হ্যাঁ এ্যাকজন পুরুষের থেকে এ্যাকজন নারীর শ্রম ক্ষমতা এক অর্থে বেশী, কারণ সে একই সঙ্গে productive ও reproductive labour কোরতে পারে। আর তাই reproduction-এর হাত থেকে মুক্তি নয়, reproduction-এর ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা, সেটাই পাঁচীর লড়াই।

পাঁচীর প্রজনন ক্ষমতা (power to reproduce) পাঁচীর নিজের রাষ্ট্রের নয়, পিতৃতন্ত্রের নয়।

হায় ভুল, কোন রাষ্ট্রের, কোন সমাজের হাতে তুমি তুলে দেবে তোমার মা হওয়ার ক্ষমতা, দাবী কোরবে তোমার মা না হওয়ার অধিকার! যে এ্যাকদিন উৎপাদন আর মুনাফা বাড়াতে তোমাকে বোলেছিলো 'শতপুত্রের জননী হও।' তুমি শুনেছিলে। আজকে ভূমিসংস্কার নিয়ে চুপ হোয়ে থেকে, বহু জাতিকের একচেটিয়া কারবার নিয়ে চুপ হোয়ে থেকে, G-7-এর কাছে জমে ওঠা সুদের বোঝা নিয়ে চুপ হোয়ে থেকে তোমাকে বলে নোংরা অপরিচ্ছন্ন হেলথ ক্যাম্পে শুয়ে টিউবেকটমি করাতে।

মা গো মা, আমার পাঁচী তো হেসেই বাঁচেনা।

পাঁচ

রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্যায় ঘোড়ার ডিম
ঘোড়ার ডিমে দিলাম তা
ফুটলো ছানা বারোটা
বারো ছানা বারান্দায়

এ্যাকটা গ্যালো প্রভুর বাড়ী
প্রভুর বাড়ার টিয়ে
জানো বড্ডো ইয়ে
কাল বোলেছে খেতে
পান সুপারি খেতে—

ছয়

বুঝলে আমরা বিপ্লব কোরেছিলাম, একটা sacrifice ছিলো আমাদের generation -এর। আমরা মা-বাপের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি। তোমাদের মতো শৌখিন ভবঘুরেমির রাস্তা নয়। এই এ্যকটা সিগারেট দাও তো। দাও দাও ওকেও দাও—এই যে তুমি সিগারেট খাবেনা? আমরা বিপ্লব কোরেছিলাম; আর তোমরা রাস্তায় সিগারেটের ধোঁয়া রিং কোরে ভাবছো—

আচ্ছা মাষ্টারমশাই; একটা কথা যদি আমাকে একটু বুঝিতে বোলতেন। এই মেয়েরা সিগারেট খেলে সেটাকে বিপ্লব বলা হয় ক্যানো? সিগারেট তো ছেলেরাও খাচ্ছে, তবে সেটা বিপ্লব নয়, কুঅভ্যাস। আপনি কিন্তু আমাকে কোনদিনও বলেননি—পাঁচীর মা তুমি সিগারেট খেয়োনা, তোমার cancer হবে। সবসময়েই বলেন পাঁচীর মা, রাস্তার লোকজন সব তোমার দিকে তাকাচ্ছে···ছি ছি!

ছাখো তুমি উচ্চশিক্ষিতা, scholar মেয়ে। তোমাকে তো এসব বোঝানোর কোনো প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়।

মাষ্টারমশাই, আপনি কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে খুব গর্বিত। আচ্ছা আপনার মোধ্যে কি এখনও আদর্শ নারীর সেই image, যা কিনা উনবিংশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রেনেসাঁর অন্যতম ফসল কাজ করে? আধুনিকা মহিলা বোলতে আপনি এমন এ্যাকটা image পছন্দ করেন যে—

(১) উচ্চশিক্ষিতা, অর্থাৎ তার বিশ্ববিদ্যালয়ের degree আছে। ফলে, সে আপনাদের লেখালেখি ইত্যাদি appreciate কোরতে পারবে। মেয়েরা appreciate কোরলে ক্যামোন এ্যাকটা আলাদা charm আসে।

(২) উচ্চশিক্ষিতা ফলে সে উপর্জন সক্ষম। শিল্প-সাহিত্য করা স্বামীকে সে ভরণ পোষণ কোরতে পারবে, বাড়ীঘর বানাবে, ছেলে মানুষ কোরবে এবং প্রয়োজনমতো সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে মোটা চাঁদা দেবে।

(৩) কিন্তু সে হবে আচারে ব্যবহারে নম্র, ভদ্র, সংযত। সে ধোরে রাখবে সংসার, tradition, আপনার নিশ্চিন্ত স্থির জীবন—সেখানে অবশ্য আপনার বিপ্লবের আঁচ পৌঁছায়না—আর আপনি প্রয়োজন হোলেই হোয়ে যেতে পারেন অনুগত বাধ্য স্বামী। আপনার তো গ্লাস খালি, আর একটু ঢালবো?

ঢালো, ছাখো আমরা বিপ্লব কোরেছি। অনেক sacrifice কোরেছি। তোমরা বাবা-মার দুধে ভাতে ঠিক এসব বুঝতে পারবে না। আর সেইতো বাবা-মার বিষয় সম্পত্তি হাত পেতে নেবে। ক্যানো নেবে না। তোমার বাবার আছে, তুমি নিচ্ছো। তোমার বাবা তো আর কিছু অনাথ আশ্রমে দান কোরে যাবে না।

সেতো বটেই, আচ্ছা মাষ্টামশাই, শুনেছি আপনারও ঘরবাড়ী কিছু আছে, বিষয় যাকে বলেন, আপনার ছেলেপিলেও আছে। তা আপনি নিশ্চয়ই সবকিছু অনাথ আশ্রমকেই দিচ্ছেন। আমাকে একটু আগে থেকে জানাবেন আমার এক জানাশোনা···আরেকটু খাবেন?

দাও, যখন দিচ্ছো। শোনো, আমাদের এ্যাকটা contribution আছে। আমাদের কিছু প্রমাণ করাব দরকার হয়না। তোমরা কিছু কোরে দ্যাখাও, প্রমাণ কোরে ছাখাও।

মাষ্টার মশাই আপনার এ্যাতো রাগ ক্যানো আমি পাঁচীর মা, আমার ছেলে পুলে আমি তো সব হেরেই বোসে আছি। বিপ্লব কোরবো কি; পাছায় টানতে গেলে মাথায় কাপড় কুলোয় না আপনি মহান বিপ্লবী, আপনার পায়ে গড় কোরি। তবে যদি অপরাধ না ন্যান, একখান কথা বলি। আপনার মুশকিলটা কি জানেন? আপনি যখন পরের দেওয়ালে পেচ্ছাব করেন, তখন আপনি বিপ্লবী। আর পরে যখণ আপনার দেওয়ালে পেচ্ছাব করে, সে তখন প্রতি বিপ্লবী। আরেকটু খাবেন? রাত কিন্তু অনেক হোয়েছে।

এই শেষ, চলো এটা গলায় ঢেলে নিয়ে উঠি। বেশি নেশা হোলে আবার মুশকিল। বাড়ী ফিরবো, পাড়ায় এ্যকটা মান সম্মান আছে তো, বুঝলে কিনা। তাই সেদিন তুমি আমার বাড়ীতে নেশা কোরতে চাইলে, আমি রাজী হইনি। আচ্ছা তোমাদের তেতলার ঘরটা তো বেশ নিরিবিলি। সেখানে এ্যাকদিন বেশ, কি বলো?

আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু একটাই অনুরোধ। কোনো মানুষকে case study বানানোর আগে এ্যাকবার ভেবে দেখবেন যে, আপনার পক্ষে অন্য

কোনো মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির দিকটা সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব নাও হোতে পারে। আপনার তো বয়েস হোয়েছে। আমি মেয়ে মানুষ পাঁচীর মা আপনাকে কি বোঝাবো।

ইতি সমাপ্ত

পরিশিষ্ট :

আঁটুল বাঁটুল শমলা শাঁটুল শাযলা গ্যছে হাটে শামলাদের মেয়েগুলো পথে রোগে কাঁদে। তখন কেউ এলো, বললো—আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলাভাজা দেবো আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেবো।

সে মেয়ের কান্না কি তাতে থামে। সে কাঁদে কেবল কাঁদে। কতো যত্নে যুগে যুগে মেয়ের এই কান্না অবতার। তার চোখের জলে কতো হৃদয় জগন্নাথ দ্রব হোলো সহানুভূতির হাত তার বুকে পাছায় হাত বুলোলো আহা—

ওমা তারপরে সেই ঘেন্নার কথা আমি পাঁচীর মা কি বোলবো ছি! ছি! কোনো কারণ নেই simply bored just bored হোয়ে সে এ্যাকদিন হেসে উঠে বলে ওমাগো হাসতে বেশ লাগে তো গো! ওমা ও হাসছে দ্যাখো। ঢং মাগীর অত হাসির ঘটা কিসের শুনি? ওর হাসি দেখলে গা জলে যায়—মরণ!

ওমা, জলে নাকি সত্যিই—ক্যানো গা?

জলজ বন্দোপাধ্যায়

যাপনস্বপ্নের বিষাদময়না

...হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি নিমতলায়।

আষাঢ়ের বেলা। কখনও রোদ কখনও মেঘলা।

স্রোতস্বতী গঙ্গা। আর শ্মশান—জীবন আর মৃত্যুর মাঝে বয়ে চলে যাপন।

দূরে চক্ররেলের হুইসিল, পাশেই মন্দিরে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি!

চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ, তাতে শুয়োর চড়ে বেড়ায়। রেললাইনের পাশে বিছুটির ঝোপ, ক্ষয়ে যাওয়া ওলগাছ, সারিসারি ঝুপড়ি, মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে বসে উকুন বাছে আর ঝগড়া করে।

ঘাটে প্রতিমার আধডোবা খড়ের কাঠামো আর কুমোরটুলির বেশ্যাদের আধা-ন্যাংটো শরীর কেমন একাকার। ডোমেরা চিতার আগুন থেকে আধপোড়া কাঠ তুলে এনে রান্না বসায়।

একের পর এক মৃতদেহ আসে—আসতেই থাকে—পাশাপাশি চায়ের দোকান, পানবিড়ি সিগরেট গাঁজা, কলকের দোকান। ঘাটের ধারে গাছ তলায় কিছু হলদে লোক নির্বিকার নীরবে পরস্পর ছিলিম দেওয়া-নেওয়া করে আর খকখক কাশে। তাদের চোখে হেরে যাওয়া অথচ প্রখর দৃষ্টি আর রোঁয়া ওঠা কুকুরের মতো বিক্ষোভক্লান্ত বেদনা। রেললাইনের ধারে বিবর্ণ দাঁত বের করা পাঁচিলে ঘুঁটে ক'টা আছে। একপাশে চোলাই-এর ঠেক, তার পাশে সাট্টার।

জেটিতে জলযাত্রীরা নামছে উঠছে। মাঝগঙ্গায় দুটো লঞ্চ আর ক'টা নৌকা ভাসছে।

আহিরীটোলা ঘাট পেরিয়ে শোভাবাজার ঘাটে আসি। ঘাটে চারটে নৌকা বাঁধা আছে। তাতে মাটির হাঁড়ি কলসি বোঝাই হচ্ছে। একটা নৌকায় মাঝিরা রান্না বসিয়েছে।

বটগাছের তলায় ঘণ্টা নেড়ে এক দেহাতী হনুমানজীর পুজো করছে। জেটির সামনে অটো চালকেরা হেঁকে যাত্রী তুলছে।

দুজন কিশোরী কাগজ কুড়ুনী শিক দিয়ে আবর্জনা ঘাঁটছে।

লাইন দিয়ে চার পাঁচটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে যাই ক্রমশঃ বেলা গড়িয়ে যায়। ভুলে যেতে চাই যে আমি সকাল থেকে দু'কাপ চা ছাড়া কিছুই খাইনি।

আজ সকাল থেকেই আমি উদ্বেগে আছি। কাল রাতে ঘরে ফিরে দরজা খুলেই আমি একটা মৃতদেহ দেখেছি। হ্যাঁ, কাল রাতেই আমি সেই মৃতকে আবিষ্কার করেছি। যদিও জানিনা এই মৃত মানুষটি কে এবং কি করেই বা আমার ঘরে এলো!

প্রায় ৫´ ১০˝ লম্বা ন্যাংটো দেহটা পড়ে ছিল।

একমুখ দাড়ি, বড় বড় দুটো আধবোজা চোখ, চওড়া রোমশ বুক, সরু কোমর, হাত ও পায়ের আঙুলে বড় বড় নখ। নখে ময়লা ঢুকে আছে।

মুখটা ঈষৎ ফাঁক। ওপর পাটির হলদে ধারাল দাঁতও দেখা যাচ্ছিল।

তার লিঙ্গ দেখলেই বোঝা যায় ঝোড়ো যাপনের নাবিরত রমণে কখনো ক্লান্ত হয়নি।

লিঙ্গের মুখের হালকা চামড়া সরানো—যেন এখনো তার জাগর পৌরুষ জাহির করছে।

মৃতের সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতমুখে শুকনো কালো রক্ত। তখনও পচন শুরু হয়নি।

মৃতের দুটো হাত দুপাশে এমন আকারে ছড়ানো আর পা দুটো জোড়া যে দূর থেকে দেখলে জমাট ধোঁয়ার একটা চতুস্তলক মনে হয়।

একটু দূর থেকে মৃতের চারপাশ পরিক্রমা করতে করতে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখা যায়, দুহাতদুপা আর গলা থেকে তলপেট—বেশ টানটান। কিন্তু খুব কাছে গেলেই শিথিলতা বোঝা যায়—ফ্রীজে রাখা ব্রয়লার মাংসের মতো।

আমার দেখে মনে হয়েছিল, কেন জানিনা, যে মৃত মানুষটি মৃত্যুর আগে থেকে মৃত্যু অবধি নীল থেকে নীল, আরও অশনাক্ত নীল হয়ে গেছিল। তার বাঁচা···সাদা দেওয়ালে পানের পিক ফেলার মতো ছোপছোপ হয়ে আসছিল—

আমি সারারাত মৃতের পাশ থেকে সরতে পারিনি। ঠায় আগলে বসে ছিলাম—তার পরিচয় জানতে চেষ্টা করেছি আর তাকে জাগাতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি, যেমন, ঘর্ষণ দলন কম্পন মোচড় চাপড় সন্ধিচালনা মুঠি দিয়ে মারা—আমার পক্ষে যা সম্ভব—কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়েছে—যখন ভোরবেলা আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনও আকাশে ঝুলে আছে শেষ রাত—

আমি শেষ চেষ্টা করেছিলাম বুঝতে যে মৃতদেহটা কার? আমারই কি?

দূরে যেখানে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে, বালিব্রীজের কাছে—দেখি, একখণ্ড কালো মেঘ!

আসন্ন বৃষ্টির কথা ভেবে আমি তাড়াতাড়ি পা চালাই—একঝাঁক সন্ধে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়েছে। তবু ক'পা এগোতেই একরাশ শকুনের মতো ঝটপট করে বৃষ্টি এসে গেল।

আমি একটা বটগাছের তলায় দাঁড়ালাম। চোখেমুখে হাতে পায়ে বৃষ্টির ঝাপটা লাগতেই অন্ধকারেও দেখতে পেলাম বৃষ্টির জল, জল নয় রক্ত। ঘন মেরুন রক্ত!

কেঁপে উঠলাম। বারবার হাতপা দেখলাম, ডানহাতের তালু দিয়ে মুখ মুছলাম—সন্দেহ নেই, রক্ত!

কয়েক ফার্লং দূরে আরও কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, উড়ালপুলের নীচে। আশ্চর্য! তারা কি বুঝতে পারছেনা যে এই বৃষ্টিতে জল নেই শুধু রক্ত। আমিই কি শুধু দেখতে পাচ্ছি?

আমি কি চিৎকার করে জানাব!

আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে গেল। আমি এখন কি করবো! আমার জামাপ্যান্ট হাত পায়ে চোখেমুখে রক্ত! রক্ত আর রক্ত।

পোড়া বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম।

অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো সন্দেহজনক হিম হাতছানি! মনে হচ্ছে শরীরের আনাচেকানাচে নিঃশব্দে জাল বুনে চলেছে আততায়ী রক্তভুক মাকড়সা।

আচমকা যেমন এসেছিল তেমনই ঝপ্ করে থেমে গেল বৃষ্টি।

আমি চোরের মতো নাকি খুনীর মতো চুপিসারে হাঁটতে শুরু করলাম। বোধহয় টলছি! আমি এখন নিজেকে লুকোতে চাই—কোথায় লুকোব! তেঁতুলবিছের মতো ফাটল কোথায় পাব? যে রক্তবৃষ্টি, আমি দেখেছি, যার চিহ্ন আমার সারা শরীরে মাখামাখি, তা আর কেউ দেখেনি এখন আমি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন! এই জগতের আমি কেউ না। সকলে যদি এই রক্তবৃষ্টি দেখে ফেলতো তাহলে কি হত?

এপাশে গঙ্গা ওপাশে রেললাইন, মাঝখানে আমি। আপাতত এখানে কেউ নেই, শুধু আছে ফুরফুরে বাতাস—যা শুশ্রোপোকার কৌশলে বারবার গায়ে অন্তর্ঘাত করছে দূরে দূরে একেকটা ল্যাম্পপোষ্ট। মাঝে মাঝে দলাপাকানো অন্ধকার—ঠিক কালো নয়, ধূসর।

হোঁচট খেলাম! ডান পা থেকে চটিটা খুলে বেরিয়ে গেল। আঃ পায়ে কি যেন ফুঁটলো। চটিটা পায়ে গলিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনের ল্যাম্প-পোষ্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে পায়ের তলা থেকে রক্ত ঝরছে! ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে ডানপাটা তুলে দেখি একটা ছোট্ট পেরেক ফুঁটে আছে আর—কোথায় রক্ত! এ যে কালো কালো তেলের মতো—মবিল! পেট্রোল! ডিজেল না কেরোসিন!

শিউরে উঠলাম! পায়ে বেঁধা পেরেকটা টেনে বার করতেই হু হু করে খানিকটা তেল বেরিয়ে এলো—

আমার মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে, চোখেও ঝাপসা দেখছি! কানে একটানা ভোঁ ভোঁ।

কি মনে করে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট, বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই ফেলে দিলাম। আমি আর বিড়ি সিগারেট ধরাতে পারবোনা—

আমি যেন মরীয়া হয়ে গেলাম! কি করি এখন! কাকে বলবো এসব—

শরীরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করে, আমিও তেমন দৌড়তে শুরু করলাম। বোধহয় রাতকানা কাকের মতো··· পেছনে যেন একটা সোরগোল শুনলাম—বোধহয় ট্রেন আসছে! আমি একলাফে রেললাইন পার হয়ে গেলাম—

গায়ে রক্ত লেগে আছে আর ভিতরে দাহ্য পদার্থ! বোধহয় হরমোনাল গ্ল্যাণ্ড-এর সিক্রিশন কমে যাচ্ছে; দৌড়তে দৌড়তে চিৎপুরে সোনাগাছির মুখে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়ালাম!

সন্ধ্যেবেলার জমজমাট সোনাগাছি!

এই গলিতে রক্তের শ্বেতকোষ ধীরগতিতে বিভাজিত হয়। গলির দুধারে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে হাসিঠাট্টা করছে বেশ্যারা। আমার একচোখ দেখছে সারা গায়ে রক্তের ছোপ অথচ দেহের ভিতরে একফোঁটা রক্ত নেই। চামড়ার নীচে তেলবাহী ধমনীগুলোর ঘন কাল, জালের মধ্য দিয়ে ছুটছে তাজা কালো তেল আর একচোখ একজনকে খুঁজছে।

খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম—একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী! তার ঘোলাটে চোখ, নীল দাঁত আর ভূগর্ভস্থ জলে নুনের মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বেশী।

এখনও বোধহয় সন্ধের প্রথম খদ্দের ধরতে পারেনি। কাছে গিয়ে বললাম, ভেতরে যাবে?

কেঁচোর মতো কিলবিল করে হেসে সাবিত্রী বললো, টাকা আছে?

বললাম, হ্যাঁ আছে চলো—

সাবিত্রী আমার অনেকদিনের চেনা। কাঁচা বয়েস তবে দেখতে শামুক অথবা কাঁকড়ার মতো তাই দরও কম। একবার ভিতরে ঢুকে টাকা দিইনি বলে সে আমার ঘড়ি খুলে নিয়েছিল। সেদিন সত্যিই আমার পকেট খালি ছিল, মালের পিছনে সব উড়ে গেছিল। তারপর থেকে ঢুকবার আগেই জিগ্যেস করে নেয়, টাকা আছে কিনা? তাছাড়া ইদানীং সে সাইনোফোবিয়ায় আক্রান্ত।

একটা সরু গলি ধরে এগিয়ে চললাম পিছু পিছু। সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়, সমস্ত শহরের পুঁজরক্তমাখা ঘা ঝেঁটিয়ে এই গলিতে ডাঁই করে ফেলেছে,

যে কোন কুত্তাই মাল না টেনে এখানে ঢুকতে গেলে, তার নার্ভের ক্ষমতা বিধ্বস্ত হয়ে যাবেই। ঘরের সামনেই একজন হলদে বমিতে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। তাকে ডিঙিয়ে আমরা ঢুকলাম। ক'টা নীলমাছি উড়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালালো সাবিত্রী। দেওয়ালে দুটো রাতভুক প্রেতের ছায়া স্পষ্ট হলো। ৮ ফুট বাই ৯ ফুট ঘরের চারটে ছাল-ছাড়ানো দেয়ালে ঝাঁক ঝাঁক আরশোলা। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে ছিল, এবার, আমাদের গা চাটার জন্যফরফর ফরফররররর শব্দে ডানা মেললো।

আমি সাবিত্রীকে বললাম, তুমি কি টের পেয়েছ, একটু আগে একচোট বৃষ্টি হয়ে হয়ে গেল।

সে পোঁদ দুলিয়ে বুক ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, টাকা দাও।

পকেট থেকে দুটো দশ আর একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলাম। সে চোখ মেরে আদর করে বললো, ঢ্যামনা!

তারপর ব্লাউজের ফাঁকে ঢুকিয়ে নিল।

ফিসফিসিয়ে বললাম, তুমি কি জানো, কিছুক্ষণ আগে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেল—

হাসিমুখে সাবিত্রী বললো, কতটা খেয়েছ আজ?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, জামাপ্যান্ট দেখে বুঝতে পারছনা···এই দেখো রক্তে মাখামাখি···সে শুনেও শুনলো না। কাপড়টা খুলে ফেললো। আমার মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে! ওর কাঁধ দুটো ধরে বললাম, যাকে বীর্য বা মাল বলে তা আমার শরীরে নেই···যা আছে তা তেল—

কোনো উত্তর না দিয়ে সায়া তুলে চৌকিতে শুয়ে পড়লো সাবিত্রী। দেখলাম, তার যোনিতে থুকথুক করছে লাল পিঁপড়ে।

আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি দেখতে চাই সাবিত্রীর দেহে রক্ত না তেল কি আছে!

চোখে পড়লো চৌকির নীচে একপাশে একটা বাংলার খালি বোতল রাখা আছে।

তুলে নিয়ে বোতলের মুখটা দেওয়ালে সশব্দে ভাঙলাম তারপর বাকি অংশটা তার তলপেটে ঘাপ করে ঢুকিয়ে দিলাম।

খানিকক্ষণ ধড়ফড় করে বোতলবেঁধা সাবিত্রী হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা করে বেশ্যার মতো হেসে উঠলো! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

আমার সারা শরীর দাউদাউ করে জ্বলছে অথচ আগুন নেই! নাক বুজে

আসছে, চোখ যেন ফেটে বেরিয়ে যাবে! গলির মোড়ে একটা দোকানের আয়নায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম—এ কি! আমার মাথার সব চুল সাদা! মুখটা পুড়ে বেঁকে গেছে। চামড়া কুঁচকে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাগুলোর শরীর পচাগলা। যেন একেকটা কুষ্ঠরোগী!

তারা হোহো করে হাসছে, তাদের মুখে দাঁত নেই! শূন্য কালো গহ্বর!

এক বেশ্যা হাঁটু অবধি কাপড় তুলে তার ঘা দেখছিল, একটা কালো কুকুর তার পায়ের গোছ থেকে একখণ্ড পচা মাংস খুবলে দৌড়ে পালাল। বেশ্যাটাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কুকুরটার পিছু পিছু দৌড়ল—

হঠাৎ ক'টা কুকুর আমার দিকে তেড়ে এলো—

আমারও মাংস পচা গলা নাকি!

ঘুরে দৌড়াবার চেষ্টা করতেই দোকানের আয়নায় চোখ পড়লো। দেখলাম, আমার দেহে আর এক ফোঁটাও মাংস নেই। মাথায় চুল নেই! রক্তমাখা জামাপ্যান্ট প'রে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশুদ্ধ কঙ্কাল!

দাঁড়িয়েই আছি। কি করবো, কোথায় যাব তা জানি না। এই রূপান্তরে আমার স্থান কোথায়? ভাবতে ভাবতেই সামনে একটা কালো বাস এসে দাঁড়াল। কয়েকজন গাঁট্টা-গোট্টা লোক লাঠি আর দড়ি হাতে নেমে এল। শুনলাম তারা নাকি খবর পেয়ে এসেছে। কেউ কেউ নাকি দিনে-দুপুরে এরকম কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে। দুজন আমাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলো। আমি বাধা দিলাম না। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোনো বিন্দুও আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

আমাকে গাড়ীতে তোলা হল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। আমাকে গাড়ির মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখান থেকে আমি আর কখনও বেরোতে পারবে না। কারণ যারা কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে, তারা আর পাঁচ জনের পক্ষে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নীলযাপন আসলে একধরণের প্যারাডক্সিক্যাল ম্যাস্টারবেশন। যা কখনও কক্ষচ্যুত হতে চায় না। জড়ানো জঙ্গলের মতো আশরীর গ্রাস করে।

আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তি অবস্থানের তলানিটুকু পড়ে থাকে নীলচেতনায়।

খালাসিটোলা বারদুয়ারি বাগবাজার গঙ্গার ঘাট কানাগলি আর বেশ্যালয়ে নীল যাপনের অখ্যান। বেশ্যার মরা শরীর থেকে আর এক বেশ্যার হলুদ শরীরে—চোরা ধর্ষণে শ্মশানের শান্তি।

তবুই এই মনোগ্রাহী যাপন প্রক্রিয়া লিঙ্গের প্রসাবন ক্ষমতার জান্তব অহংকারে নির্ভরশীল। মন তার শরীরি অন্ধকার খেয়েই বেঁচে থাকে। এই অন্ধ আত্মমেহন এমনই এক স্বাভিভাবন যা কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াতে দেয়না।

দুঃস্বপ্নের আধিক্য কোষগুলোকে নিস্তেজিত কোরে এক স্নায়ুবিকল নীলনিষ্ঠুরতা উঠে আসে যা নিজের ভীরুতাকে ধর্ষনকারীর মুখোশ পরিয়ে দেয়। এই মুখোশ যাপনের চোরাগলিতে পোষা থাকে আর ক্রমশ এক দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়।

শুরু হয় নীল অবস্থান লুকোনোর ব্যক্তিযুদ্ধ। তারপর স্থলনের আঁশটে তাড়নায়—সোনাগাছি-হাড়কাটা-শেঠবাগান - কালিঘাট - তাঁতিপাড়া (নীল ক্রব্যাদ!) অবশেষে বিশুদ্ধ কংকালে রূপান্তর—

পুনশ্চ

আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ওখানে যাদের রাখা হয়েছে তাদের অপরাধ গুরুতর—যেমন, একজন চেয়েছিল সারাজীবন বিভিন্ন নেশায় ডুবে থাকতে। আর একজন চেয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিচারে খুন করতে। কেউ হয়তো চেয়েছিল বিখ্যাত ও নমস্য ব্যক্তিদের যৌনজীবন জানতে তাই—

এদের তুলনায় আমার অপরাধ কম। আমি তো শুধু রক্তবৃষ্টি আর গলিত-জীবন দেখে ফেলেছি, তাই আমার শরীরে আবার রক্তমাংস প্রয়োগ করে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়ে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?!।

কৌশিক ঘোষ

অনিদ্রা

সারাটা রাত পায়ের শব্দ
কে ফেরে আশেপাশে ?
অসহ্য সে, অসংবদ্ধ,
আমারই অভ্যাসে।

পায়ের শব্দে জেগেই থাকি
কে আসে, সে কি ঘুম ?
স্বপ্ন তার খোঁচায় না কি
পালঙ্কময় ঘুন ?

এবার বীণা

সে চলে যাবার পর দেখি তার মিথ্যার মূর্ছিত মায়া
পড়ে আছে অনন্ত রাত্রির মতো।

দূরতর নীল আলো তার
অতল আকাশ থেকে কেঁপে কেঁপে মিলায় আবার।
জানি সে গিয়েছে ভেসে অনেক পিছনে,
পিছু ফিরে তবু দেখি—নেই, কিছু নেই,
সামনে এগোলে লাগে ভয়,
সে বুঝি নিয়েছে মেনে স্থির পরাজয়!
ক্ষুব্ধ রাতের কূলে কূলে
ভাঙনের গান শুনি তাই সব ভুলে।

অন্ধকার, অঙ্গবিহীন
নিঃসঙ্গতার পাকে বেদনাকে বেঁধেছে স্বাধীন।

কে, এক দুঃখজয়ী অন্ধ ফুলওয়ালী
আলোর বাগানে একা গান গেয়ে গেয়ে—
আলোয় আলোয় ভরে আঁধারের ডালি
আমাকে জাগালো আজ এমন সময়ে!

আলোক সম্ভবা তন্দ্রা
তন্থ তার গহন নিদ্রাভেদী ঝংকারে ঝরা।
তোমাকে বাজাব আজ, জাগাব দৃষ্টিহীন, ওগো দরদীয়া!
অপরাজিতার নীল, নত, উন্নত।

দীর্ঘ জন্মান্তরের শেষে ফিরে এলাম কৈশোরের ভ্রমণের দেশে।
আমাকে দেখেই সব্বাই থামিয়ে ফেলল
ওদের পরস্পরের চোখে চাওয়া, ফিশফাশ আলোচনা
গল্প-গুজব, হাসি-মস্করা
মৃত ছবিদের মিউজিয়মের মতই গম্ভীর ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে রইলো
দূরের ডাকবাংলো আর শিমূল গাছটা, মণ্টুদার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

মনে পড়ল না কিছু, আর তাই কি বাজলো মনে বড়ো
অগাধ জলের থেকে চুপি চুপি
জাহাজের তলদেশে জমে ওঠা জলের মতন—
পূর্বজন্মের থেকে বহে আসা ওই মৃদুবার্তাগুলি
আর তাতে ভেসেছিলো পথিক মেঘের সেই ছায়া
নবীন ডানার উল্লাশে পাহাড়ের সবুজ তরঙ্গে
নেচেছিলো প্রাণের পাখিরা
রাঙা পথগুলো ছিলো ঝর্ণার মতো
গানে গানে, গল্পে-ভ্রমণে সাথে ছিলে প্রিয় বন্ধুরা…
আজ দেখি জলের দিগন্ত ঘিরে ছিন্ন মালার মতো
পড়ে আছে দিকবালিকারা
আর তারি ফাঁকে ফাঁকে চকিত পরশে শূন্যে বিলালো কতো মায়ার হরিণ
অথবা পিছন ফিরে দেখি যে বুকের খুব কাছে
ভঙ্গী বদল ক'রে বিষাদ বাধার উথানে দাঁড়িয়ে রয়েছে
সেই চিরচেনা পাহাড়ের দল
যুগান্তের বঞ্চিত বঞ্চনার প্রবল শ্রান্তিভারে
রোমওঠা মহিষের মতো ওরা গতিহীন, প্রত্যাশাহীন—
কোথায় সন্ধ্যাদীপের নীড়, এই দেশে?

আকাশের মৃত্যুমোহাচ্ছন্ন বিশাল ডানার বিস্তারে
সে কি দোলে পাহাড়ের ওই পারে
রাত্রির অন্য কোনো পারে ?

দুপুরের ধা ধা রোদে আমার সঙ্কুচিত ছায়া
আজ সাঁওতাল বৃদ্ধের মতন দেখালো
এবার ফিরতে হবে দিনাহুদিনের অনুবর্তনের
পায়ে পায়ে ফিরে যাওয়া পথে···
শালপাতাঝরা হাওয়া, মহুয়ার মাতাল বাতাস
তবু কেন পিছু ডেকে খিল খিল হাসে ?
রাঙা নদীটির ভাঙা ঝাঁকা দূর থেকে দেখে মনে হয়
বহতা সুরের স্তব্ধ ফেলে আসা বাঁশি।

এক ফোঁটা জল

দুচোখের একফোঁটা জল
কিছুতেই মুছতে পারি না
বাররার ভিজে যায় মন, মরুভূমি
উইণ্ডস্ক্রীনের ওয়াইপারের মতো
বারবার মুছি, আর জলে ভরে যায়
পথঘাট, দৃশ্য, ঘটনা···

কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো
ভাবনার আলো-অন্ধকারে
তোমাকে তো তাড়াতে পারি না।
হয়ত বা প্রেতার্ত হাত পেতে আছো
তার মুঠি টানছে আমাকে···

আমার যাবার পথ দ্রুত দুরতম
সামনে রাতের কালো গাড়ি
সে এখানে থাক না ঘুমিয়ে !
অশ্রুবিন্দুগুলি মুছে যাবে
কেউ জানবে না।

পাখি

তোমাকে পেলাম কুড়িয়ে ও কালো পাখি !
শব্দ শেখোনি, শোনাও রাতের শিস—
ব্যর্থ বাঁচার খাঁচার এ-পৃথিবীতে,
জ্ঞানের আলোয় দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিতে,
ভয় হয়, পাছে আত্মমোহের ফাঁকি তোমার দু'চোখে ঝরায়
অন্ধ বিষ !

আমার আকাশে

আকাশে—করুন ধোঁয়ার মতো মেঘে মেঘে ছড়ানো আকাশে—ওই ডুবে যাওয়া শান্ত নীলিমায়—এই ফালগুনের আলোয় আলোয় ভরা আকাশে আকাশে—আমার চিরদিনের চিরশান্তির স্থির দেশখানি ফালগুনের বিকেলের আকাশ যেন খেলা-ভাঙা মাঠ—যেন আমার ছেলেবেলা—আমাকে ডাক দেয় অনেক উঁচুতে। বাদলা দিনের মেঘলা আকাশে চাইলেই আমার মনে পড়ে বাবার কথা। বাইরে অঝোর বৃষ্টির খাঁচা, আর ভিতরে আমাকে কোলে বসিয়ে আবোল তাবোল কথায় এস্তার বেসুর লাগিয়ে বাবা জুড়েছেন—ব্যয়না যো··· । আর খাঁচার বাইরে কদমের ডালে চুপ করে ভিজছে একটা ছোট্ট কালো পাখি। মনে হড়ে আমাদের হতদরিদ্র সংসার, পাল্লাভাঙা জানালার পাশে বাবার রোমান্টিক মন, উনুনের ধোঁয়ার ভিতর হারিয়ে যাওয়া মায়ের কার্বণ ক্লান্তি। আর মনে পড়ে সেই কাহিনীবিহীন দিনগুলোর গরীব বন্ধুদের কথা, আর আমার ভেঙে যাওয়া দামী খেলনাগুলো। একদিন মেঘে মেঘে বয়স বাড়লো। মেঘেরই মত সেদিন ভেসে ভেসে গিয়েছি কতো দূরে দূরে। দুপুরের দীপ্র আকাশ আয়নার মতো অন্যমনে চমকে দিয়েছে কতোদিন। এভাবেই একদিন ভোরের আকাশের আলোর ঝর্ণাতলায় দিগন্তের বনপথে আমি প্রথম তোমাকে দেখলাম। তারপর আর একাদন তোমার কাছ থেকেই পেলাম ভারী নিঃসঙ্গ একটা রাতের আকাশ। কালোয় আলোয় তুমি মিশে রইলে কলঙ্কিনী প্রিয়ার তীব্র চাপা কৌতুকের মতো। অজানা পথের খেয়া—তোমার স্বপ্নের গানে কেটে গেল কাল সারারাত। আজ আকাশে—করুণ ধোঁয়ার মতো মেঘে মেঘে জড়ানো আকাশে—এই ফালগুনের আলোয় আলোয় ভরা আকাশে আকাশে—ওই ডুবে যাওয়া শান্তনীলিমায়—আমার চিরদিনের চিরশান্তির স্থির দেশখানি। শুধু একটা পাখি—সেই শৈশবের ছোট্ট একটা কালো পাখি, কি বিশাল ডানার বিস্তারে প্রকৃতির স্থির তুলাদণ্ডের মতো আকাশে রয়েছে আজ ভেসে। ভেসে ভেসে যাচ্ছে, আর পাখায় পাখায় সে খুঁড়ে যাচ্ছে এই ফালগুনের বিকেলের মেঘে মেঘে জড়ানো নীলিমা।

কন্যাকুমারী

হিমালয়ে যাব ব'লে, সটান এলাম চলে, কন্যাকুমারী
কেন না আমি তো থাকি দমদমে—
নিরালা অন্ধকারে তোমার নিকটে এসে, হে নিরভিসারী,
দাঁড়ালাম, অদম্য দুর্ব্বলতার সর্বস্বশেষ বিক্রমে।

আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সে উদ্যত ফণার বিস্তারে
জীর্ণ শরীর তার ছিন্ন কশার কালো, বিজলীর প্রহারে প্রহারে,
নানা দিক ভ'রে ছেড়ে নানা রঙ, নানা ছলাকলা ও কুসুমে,
তারি মাঝে সে যেন পাথর এক, শ্যাওলার নবীনতাগুণে।

রাতের আলাপ ধীরে উঠেছিলো জ'মে
আর প্রতি পলে পলে ওই আঁখি, ওই রূপদেনা নেহারি,
সে কালো ভ্রমরদুটি উড়ে যায়, চোখের পাতায় বসে ভ্রমে,
আকাশ বিহারী বুঝি হতে চায়, সে শয়নচারী!

সে আমাকে বলে—এসো, মেলে দেই অন্ধ বুকের দুই ডানা…
আমি ব'লে উঠি—সে কি! না…না…
যখনি নামলো দুই ভুরুর নয়নভীরু মানা
গুহার আঁধারে তার পৌঁছলো আলোর ঠিকানা।

তখন বাইরে এসে, এমনি তাকিয়ে দেখি ভোরের প্রথম সাদা পাতা,
যদিও মুখের স্বাদ স্বাভাবিকভাবেই তো তিতো!
ভেসে আসে ভবিষ্যত, হিমালয়শিখরের আভাসিত কথা,
এবং রয়েছে মনে নিরাবরণ অতীতও

পাপের গভীরে আমি প্রোথিত করেছি এক পুণ্যের বীজ—
তবু সে গিয়েছে রয়ে পাতালেরো অধমের নীচ
আজো তার কঙ্কাল আমারি নিজের হাতে আছে মাটিচাপা—
শিখার কালির মতো তবু সে বাড়ায় হাত, স্বপ্নে—কাঁপাকাঁপা!

ভোরের স্বপ্ন

ভোরের স্বপ্ন আজ আকাশে উঠেছে মৃদু হেসে
আর মিলালো অলীক কতো আঘাত, অশ্রু, অপমান
কখনো অন্ধকার জাগিয়েছে প্রলয়ের ত্রাস
কখনো নিজে সে জেগে শুনিয়েছে নিদ্রার গান।

বিদায়ের একটি কথার গাঁথা আপাপবিদ্ধ সেই সন্ধ্যার তারা
ভোরের স্বপ্ন ভেঙে দাঁড়িয়েছে আমারি এ অঙ্গনে এসে,
শৈলচূড়ার থেকে বেজে ওঠে গৈরিক আলোর দোতারা
তোমার বিরহ থেকে আগমনী গান ভেসে আসে।

মন্তাজ

মুহূর্তস্রোতে বদলে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের মেয়ে
যুগের হাওয়ায় খসে খসে যায় সাল তারিখের পাতা
দিন কেটে যায় ক্যালেণ্ডারের স্থির ছবিটিতে চেয়ে
মনের গহনে হারিয়ে ফেলেছি মনেরই পুরনো কথা

ছড়িয়ে যাচ্ছো ভবিষ্যতের দূরতর বিস্তারে
জড়িয়ে আসছো জীবনের সব চিন্তায়, শত কাজে…
তবু রয়ে যাও কঠিন বাধার দুর্গম দুস্তরে
বিজ্ঞাপনের মন দেয়া-নেয়া প্রকৃতির মন্তাজে!

স্ববিরোধ

যখনি তুলেছি ধ'রে উর্দ্ধে আড়াআড়ি
আত্মবিশ্লেষণের দুটো তরবারি—
ছিটিয়ে বিদ্রূপ, ঘৃণা, ক্রোধ
বলেছো তফাতে সরে—এ কি স্ববিরোধ!

স্যামুয়েল বেকেট

গনগনে ছাই

চরিত্র

হেনরি ; অডা ; অডি ; সঙ্গীত শিক্ষক ; রাইডিং মাস্টার

সমুদ্রের শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

অমসৃন নুড়িপাথরের উপর হেনরির বুটের শব্দ : সে থামে।

সমুদ্রের শব্দ একটু জোরে হয়।

হেনরি □ শুরু। [সমুদ্র, আরো জোরে কণ্ঠস্বর।] শুরু। [সে নড়তে থাকে। বুটের শব্দ হয়। যেন সে চলছে] থামে। [বুটের শব্দ হয়। যেন সে চলছে, আরো জোরে।] থামো। [সে থামে। সমুদ্র আরো একটু জোরে।] নামো। [সমুদ্র। কণ্ঠস্বর আরো জোরে।] নামো। [যেন সে বসে এমনই ধপ করে শব্দ হয়। সমুদ্র, এখন ক্ষীণ, যেমন ইঙ্গিত করে যেভাবে বিরতির নির্দেশ দেয় সেই রকম অনুসরণ করতে শোনা যায়।] এখন আমার পাশে কে ? [থামে] একজন বুড়ো লোক, অন্ধ এবং নির্বোধ। [থামে] আমার

বাবা, মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে, আমার সঙ্গে থাকার জন্য। [থামে] যেন সে মরেনি। [থামে] না, মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে শুধু মাত্র, আমার সঙ্গে থাকার জন্য, এই অদ্ভুত জায়গায়, এই অচেনা জায়গায়। [একটু থামো] আমাকে কি শুনতে পায় ? [একটু থেমে] হ্যাঁ, বাবা শুনতে অবশ্যই পারবে। [একটু থেমে] আমাকে উত্তর দেবে ? [একটু থেমে] না, ও আমায় উত্তর দেবে না। [একটু থেমে] শুধুমাত্র আমার সঙ্গে থাকবে। [একটু থেমে] তুমি সমুদ্রের শব্দ কেবল শুনবে [একটু থামে। শব্দ জোরে হয়] আমি বলছি তুমি যে শব্দ শুনবে তা হল সমুদ্রের, আমরা সমুদ্র তটে বসে আছি [একটু থামে] আমি বলে দিচ্ছি কারণ শব্দটি এতই অচেনা, অদ্ভুত, শব্দ এতই সমুদ্রের সঙ্গে অমিল যে তুমি যদি না দেখে থাকো এটা কেমন তাহলে জানবেই না এটা সমুদ্রের। (একটু থেমে) খুরের শব্দ। (একটু থামে। আরো জোরে।) খুরের শব্দ। (শক্ত রাস্তার ওপর খুরের শব্দ হতে থাকে, যেন হেঁটে চলেছে। শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যায়। একটু থামে) আবার ! (আগের মত খুরের শব্দ। একটু থামে। উত্তেজিত ভাবে) সময়টা ঠিক রাখে এমন শিক্ষা দাও ! ইস্পাতের জুতো পরাও, বেঁধে রাখ চত্বরে, সারাদিন ধরে চুরমার করেছে ! (একটু থেমে) একটা দশ টনের হাতি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে, ইস্পাতের জুতো, জগৎটাতে চুরমার করেছে। (একটু থেমে) এর কথা শোন। (একটু থেমে) এখন আলোর কথা শোন, তুমি সবসময় আলো ভালবাসতে, দুপুর তো বেশি পেরিয়ে যায়নি আর সমস্ত তীরভূমি ছায়ায় ঢাকা, সমুদ্র যতটা সম্ভব দ্বীপ থেকে বাইরে। (একটু থেমে) তুমি কখনো এই উপসাগরে থাকোনি, তুমি জলের ওপর রোদ চাইতে, সেই সন্ধের স্নানের জন্য, প্রায়ই একবার। কিন্তু যখন আমি তোমার টাকা পেয়েছিলাম, আমি পার হবার জন্য নড়েচড়ে উঠি, সম্ভবত তুমি তা জানতে পার। (একটু থেকে) তুমি আমরা তোমার দেহ কখনো দেখিনি, তুমি জান, প্রমান হিসেবে এই অযৌক্তিক সময়টা ধরে রেখেছি, ওরা বলে, প্রমাণ করবার জন্য কিছু নেই যে তুমি আমাদের সকলের থেকে পালিয়ে গিয়েছ, আর বেঁচে আছ, বেশ ভালভাবে মিথ্যে নামের আড়ালে আর্জেন্টিনায় বেঁচে আছ উদাহরণ স্বরূপ, যাতে মা খুবই শোক পায়। (একটু থামে) সেক্ষেত্রে আমিও তোমার মত, এর থেকে দূরে থাকতে পারি না, কিন্তু আমি কখনো ভেতরে যাই না, না। মনে হয়, আমি শেষবার তোমার সঙ্গেই ভেতরে গিয়েছিলাম। (একটু থেমে) শুধুমাত্র এর

কাছাকাছি হওয়া (একটু থেমে) আজ শান্ত, কিন্তু বাড়িতে ওপর থেকে প্রায়ই শুনি, রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছে। কথাবার্তা শুরু করে, ওহ শুধুমাত্র ডুবে যাওয়ার শব্দ, বেশ, অথচ কেউই দেখল না (একটু থামে) কিন্তু আমি কোথায় আছি সেটা কোন ব্যাপারই নয়, এখন আমার কথাবার্তা রয়েছে, এই অভিশপ্ত ব্যাপার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, সুইজারল্যাণ্ডে। কখনোই এসব সেখানে বন্ধ হয়নি। সারা সময় জুড়ে ছিল। (একটু থেমে) কাউকে আমি প্রয়োজনের মত ব্যবহার করিনি, শুধুমাত্র নিজে, গল্পগুলো, একজন মহান মানুষের, একজন বৃদ্ধ মানুষ যার নাম হল বোল্টন। আমি তাকে কখনো শেষ করিনি। তাদের একজনকে কখনো শেষ করনি, কোন কিছুই কখনো শেষ করনি, সব সময় চিরদিন চলবে। (একটু থেমে) বোল্টন। (একটু থেমে; আরো জোরে) বোল্টন। (একটু থেমে) আগুনের আগে। (একটু থেমে) আগুনের আগে সব সাটারগুলো···না, পর্দাগুলো, সব পর্দাগুলোকে টানা হল আর আলো, না কোন আলো নেই, শুধুমাত্র আগুনের আলো, ওখানে বসে···না, দাঁড়িয়ে, ওখানে দাঁড়িয়ে, এই অন্ধকারে অগ্নিকুণ্ডের ওপর আগুনের সামনে, চিমনির ওপর হাত দুটো নিয়ে, হাতের ওপর মাথা, পুরনো লাল ড্রেসিং-গাউনটা পরে অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে আগুনের আগে, কোন শব্দ নেই বাড়িতে, শুধুমাত্র আগুনের শব্দ (একটু থেমে) তার পুরনো লাল ড্রেসিং-গাউন পরে যে কোন সময় আগুনের ভেতর যেতে পারত যেমন সে শিশু বয়সে যেতে পারত, না, সেটা ছিল তার পাজামা, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, কোন আলো নেই, শুধুমাত্র আগুনের আলো, আর কোন রকম শব্দ নেই, শুধুমাত্র আগুন, একজন বৃদ্ধ রয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদে। (একটু থেমে) তখন দরজায় বেলের শব্দ। ওপরে জানালার দিকে ছুটে যায়, পর্দাগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়, চমৎকার বুড়ো লোকটি, বেশ বড়, শক্ত সামর্থ্য, শীতের রাতে উজ্জ্বল। সবত্র বরফ, ছুঁচ ফুটানো ঠাণ্ডা, শাদা পৃথিবী, চিরহরিৎ গাছের ডালগুলি ভারে নুয়ে পড়েছে, তারপর বেলটি যেমন বাজাবার জন্য হাতটি ওপরে উঠেছে সে চিনতে পেরেছে—হোলোওয়ে——(দীর্ঘ বিরতি)—হ্যাঁ, হোলোওয়ে, চিনেছে হোলোওয়ে, নিচে নেমে যায়, দরজা খোলে। (একটু থেমে) বাইরে সব স্থির। একটিও শব্দ নেই, হতে পারে কুকুরের চেনের শব্দ বা একটি ডালের কড়মড় শব্দ, তুমি যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক, এই সবই শুনতে, শাদা পৃথিবী, হোলোওয়ে তার ছোট্ট

কালো ব্যাগ নিয়ে, কোন শব্দ নেই, ছুঁচ ফোটা ঠাণ্ডা, ছোট্ট, শাদা পূর্ণিমার চাঁদ, হোলোওয়ের জুতোর নালগুলো আঁকা বাঁকা করে হেঁচড়ানো, লিরাতে ভেগা সবুজ, দারুন সবুজ (একটু থেমে) লিরাতে ভেগা সবুজ, দারুন সবুজ। (একটু থেমে) কথা অনুসরণ করে সিঁড়ির ওপর, নেই, ঘরে, ঘরের পেছনে, কথা শুনে আবার ঘরের পেছনে, হোলোওয়ে: 'আমার প্রিয় বোল্টন, এখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। যদি এ যথেষ্ট ভাল হয়ে থাকে—' এর বেশি না পাও, বোল্টন: 'প্লিজ! প্লিজ!' তারপর নিস্তব্ধ কোন শব্দ নেই, শুধুমাত্র আগুন, সব কয়লা, এখন পুড়ছে, হোলোওয়ে আগুনের ওপর শূয়রের মাংস টোস্ট করার চেষ্টা করছে, বোল্টন, কোথায় বোল্টন, কোন আলো নেই, শুধুমাত্র আগুন, জানালার দিকে বোল্টন পর্দাগুলোয় পিঠ লাগিয়ে, তার হাত দিয়ে খানিকটা ধরে রেখেছে, বাইরে তাকায়, সাদা পৃথিবী, এমন কি চুড়োতে, বায়ুযান যন্ত্রটার দিকটা সাদা, খুবই অস্বাভাবিক, বাড়িতে নিস্তব্ধতা, কোন শব্দ নেই, শুধুমাত্র আগুন, এখন আর কোন আগুনের শিখা নেই, জলন্ত কয়লা। (একটু থেমে) জলন্ত কয়লা (একটু থেমে) পাল্টে যাচ্ছে, বাতিল হয়ে যাচ্ছে, সকলের অলক্ষ্যে, ভয়ঙ্কর শব্দ, কয়লের ওপর হোলোওয়ে, চমৎকার বুড়ো লোকটি, ছ'ফুট, মোটা পাগুলো ফাঁক করে, হাত দুটো পেছনে, তার পুরনো ম্যাকফার লেনের একটা কোনা ধরে, বোল্টন জানালার কাছে, তার লাল ড্রেসিং গাউনটা পরে বেশ রাজকীয় শরীর দিয়ে, পর্দাগুলোর দিকে পেছন ফিরে, ফুঁটোটাকে হাত দিয়ে হেঁচড়ে বড় করে, বাইয়ে তাকায়, সাদা পৃথিবী, বড় বিপদ, কোন শব্দ নেই, শুধুমাত্র জলন্ত অঙ্গার, মরে যাওয়া শব্দ, ফুলকি নিভে যাচ্ছে, হোলোওয়ে, বোল্টন, বোল্টন, হোলোওয়ে, বুড়ো লোক দুটো, বড় বিপদ, সাদা পৃথিবী, কোন শব্দ নেই। (একটু থেমে) শোন। (একটু থেমে) চোখ দুটো বোজ, আর শোন, এটা কি তা ভেবেছিলে? (একটু থেমে, প্রচণ্ড ভাবে।) এক ফোঁটা, টপ! এক ফোঁটা, টপ (টপ টপ জল পড়ার শব্দ) না! (শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। একটু থেমে) বাবা! (একটু থেমে। রেগে) গল্প, গল্প, বছরের পর বছর গল্প গল্পগুলো, এখনো আমার কাছে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, একজনের জন্য, আমার সঙ্গে থাকার জন্য, যে কেউ, একজন অপরিচিত, কথা বলার জন্য, কল্পনা কর আমার কথা সে শোনে, তার জন্য বছরগুলো, আর তখন, এখন, কারো, জন্য সে—আমাকে চেনে, সেই পুরনো দিনগুলোতে, যে কেউ, আমার সঙ্গে থেকে, কল্পনা কর সে আমার কথা শোনে,

আমি কি, এখন। (একটু থেমে) কোন মঙ্গল নেই (একটু থেমে) ওখানে নেই (একটু থেমে) আবার চেষ্টা করে। (একটু থেমে) সাদা পৃথিবী, কোন শব্দ নেই। (একটু থেমে) হোলোওয়ে। (একটু থেমে) হোলোওয়ে বলে সে যাবে, একটা কালো গরাদের সামনে যদি তাকে সারারাত বসে থাকতে হয় তবুও বুঝতে পারে না। একজন লোককে ডাকে, এক পুরনো বন্ধকে, এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে, একজন পুরনো বন্ধুকে, জরুরী দরকার, ব্যাগটা আনে, তারপর কোন কথা নয়, কোন ব্যাখ্যা নেই, কোন তাপ নেই, কোন আলো নেই, বোল্টন: 'প্লিজ! প্লিজ!' হোলোওয়ে, কোন সতেজতার ব্যবস্থা নেই, কোন স্বাগত আহ্বান নেই, হাড়ে মজ্জায় প্রচণ্ড কাঁপুনি, তার মৃত্যুকে ধরেছে, বুঝতে পারে না, অদ্ভুত ব্যবহার, পুরনো বন্ধ, বলে সে যাবে, নড়ে না, একটি শব্দও নেই, আগুন নিভে যাচ্ছে, সাদা কড়িকাঠ জানালা থেকে, নারকীয় দৃশ্য, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সে আসে না যেন, কোন মঙ্গল নেই, আগুন নিভে গেছে, কনকনে ঠাণ্ডা, রড় বিপদ, সাদা পৃথিবী, কোন শব্দ নেই, কোন মঙ্গল নেই (একটু থেমে) কোন মঙ্গল নেই (একটু থেমে) এর জন্য করতে পারবে না। (একটু থেমে) শোন! (একটু থেমে) বাবা! (একটু থেমে) এখন তুমি আমায় চিনবে না, তুমি দুঃখিত হবে, তুমি কখনো হয়েছ কিন্তু এখন তুমি দুঃখিত হয়ে আছ, ধুয়ে মুছে গেছে, সেই আমি শেষ বারের মত শুনেছি, ধুয়ে মুছে গেছে। (একটু থেমে। বাবার কণ্ঠস্বর অনুকরন করে) 'তুমি কি একটুর জন্য আসবে?' 'না'। 'এস, এস' 'না'। চোখ ধাঁধানো আলো, দরজার দিকে একটা গুড়ি, কাটা, ওল্টানো, চোখ ধাঁধানো আলো। 'এক হতাশা, সব, তুমি যা, এক হতাশা, সব ধুয়ে মুছে গেছে!' (ভীষণ জোরে দরজা বন্ধ হবার শব্দ। স্বল্প বিরতি) আবার! (দরজা বন্ধ হবার শব্দ। স্বল্প বিরতি) বন্ধ জীবন ঐ রকম শব্দেই বন্ধ হয়! (একটু থেমে) হতাশা। সব ধুয়ে মুছে যায়। (একটু থেমে) ক্রাইস্টের কাছে তার প্রার্থনা। (একটু থেমে) অডার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি, দেখা হয়েছিল, বা তোমার দেখা হয়েছিল, আমি কোন কিছু মনে করতে পারছি না, এটা কোন ব্যাপার নয়, কেউই তাকে এখন জানে না। (একটু থেমে) তুমি কি মনে কর সে কেন আমার বিরুদ্ধে, আমি মনে করি ঐ শিশুটি, ভয়ঙ্কর পুচকে জীবটি, ভগবানের ইচ্ছে আমরা ওকে যেন কখনো না পাই, মাঠে ওর সঙ্গে কথা বলতাম, যীশু ওঃ দুঃখজনক ব্যাপার, ও আমার হাত ছাড়ত না, কথা বলে পাগল হয়ে

যেতাম। 'এখন দৌড়াও, অডি, ভেড়াগুলোর দিকে তাকাও।' (অডির কণ্ঠস্বর নকল করে) 'না পাপ্পা' 'দৌড়োও, দৌড়োও।' (কেঁদে ওঠে) 'না পাপ্পা' (রেগে) 'দৌড়োও যখন তোমাকে বলা হচ্ছে, ভেড়াগুলোর দিকে তাকাও। (অডির কান্না আরো জোরে। একটু বিরতি) অডাও, ওর সঙ্গে কথা, কিছু কথা, ওর মত নরক আর কি হতে পারে, যা খুশি হোক, সেই পুরনো সুন্দর দিনগুলো সম্পর্কে লিখেতে বকবকানি, মধুর ছোট্ট গালগল্প আমরা কামনা করতাম, আমরা সেসময় মৃত (একটু থেমে) পঞ্চাশ বছর আগের মাখনের দাম। একটু থেমে) আর এখন। (একটু থেমে। গম্ভীর ঘনায় ক্রোধ প্রকাশ পায়) এখন ব্লু ব্যাণ্ডের দাম! (একটু থেমে) বাবা! (একটু থেমে) তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি ক্লান্ত (একটু থেমে) সব সময় সেটাই হল পথ, তোমার সঙ্গে পর্বতের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর কথা আর কথা, তারপর হঠাৎ না আর বাড়িতে ক্লেদাক্তভাবে থাকা, কয়েক সপ্তাহ আত্মার সঙ্গে কোন কথা নয়, গোমড়া মুখো পুচকে বেজন্মা, মৃত্যুর চেয়ে ভাল, মৃত্যুর চেয়ে ভাল (দীর্ঘ বিরতি) অডা (একটু থেমে। আরো জোরে) অডা!

অডা □ [দূরের থেকে শোনা যায় নিচু কণ্ঠস্বর] এই যে

হেনরি □ এতক্ষন ওখানে ছিল?

অডা □ কিছুক্ষন। [একটু থেমে] থামলে কেন, আমাকে নিয়ে কিছু ভেবো না। [একটু থেমে] তুমি কি চাও আমি চলে যাই? [একটু থেমে] অডি কোথায়?

সামান্য বিরতি।

হেনরি □ ওর গানের মাস্টারের সঙ্গে [একটু থেমে] আজ আমার কথার উত্তর দিচ্ছ?

অডা □ ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসাটা তোমার উচিত নয়, তোমার শরীরের পক্ষে ভাল নয়। দাঁড়াও তো শালটা নিচে পেতে দিই [একটু থেমে] ভাল হবে এটা?

হেনরি □ কোন তুলনা নেই, কোন তুলনা নেই [একটু থেমে] আমার পাশে কি বসবে?

অডা □ হ্যাঁ [বসার কোন শব্দ হল না] ওভাবে? [একটু থেমে] বা ওভাবে তোমার পছন্দ? [একটু থেমে]

কোন গুরুত্ব দাও না। [একটু থেমে] বেশ কনকনে ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, আমি আমি আশা করেছিলাম তুমি তোমার জার্মান সৈনিক পোশাকটা পরবে [একটু থেমে] হেনরি তুমি কি ঐ পোশাকটা পরেছিলে?

হেনরি □ তাতে কি হয়েছে, আমি পোশাকটা পরেছিলাম তারপর আবার খুলে রেখেছিলাম আমি আবার পোশাকটা পরেছিলাম তারপর আবার খুলে রেখেছিলাম তারপর ওগুলো তুলে রেখেছি তারপর আমি—

অডা □ এখন কি পরেছ?

হেনরি □ জানি না। [একটু থেমে] খুরের শব্দ [একটু থামে। আরো জোরে।] খুরের শব্দ! [শক্ত রাস্তায় হেঁটে যায় এমন খুরের শব্দ। দ্রুত শব্দ মিলিয়ে যায়।] আবার!

খুরের শব্দ আগের মত। একটু বিরতি।

অডা □ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?

হেনরি □ ভালভাবে নয়।

অডা □ লাফিয়ে লাফিয়ে?

হেনরি □ না। [একটু থেমে] ঘোড়া কি সময় নির্দেশ করতে পারবে?

সামান্য বিরতি।

অডা □ তুমি যা বোঝাতে চাইছ সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

হেনরি □ [বিরক্তি সহকারে] একটা ঘোড়াকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে কি? আর চার পায়ের সাহায্যে সময় নির্দেশ করতে পারা যায় কি?

অডা □ ও। [একটু থেমে] সবই শৌখিনভাবে আমি করতাম [অডা হাসে। একটু থামে] হাসো, আমি তোমায় প্রতিদিন ঠাট্টা করতাম না; [একটু থেমে] হাসো, আমার জন্য তুমি হাসো হেনরি।

হেনরি □ তুমি চাও আমি হাসি?

অডা □ একবার তুমি চমৎকার হেসেছিলে, সেই হাসিই তোমার প্রতি আমায় আকর্ষণ করেছিল। সেই হাসি আর তোমার মৃদু হাসি [একটু থামে] এস, তুমি সেই পুরনো দিনের মত হয়ে উঠবে।

সামান্য বিরতি। সে হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

হেনরি □ সম্ভবত হাসি দিয়ে আবার শুরু করা উচিত। [হাসির জন্যে থামে] তোমাকে সেই হাসি আকর্ষণ করেছিল? [একটু থেমে] আমি এখন আবার চেষ্টা করব। [দীর্ঘ ভয়ঙ্কর হাসি] সেই অতীত দিনের মত আকর্ষণীয়?

অডা □ ওহ হেনরি!

সামান্য বিরতি।

হেনরি □ এটা শোন [একটু থেমে] ঠোঁটদুটো, চোয়ালগুলো! [একটু থেমে] এর থেকে পালাও! আমার নাগাল কোথায় পাওয়া যাবে না! পম্পাস! কি?

অডা □ শান্ত হও।

হেনরি □ আর আমি এই তীরে থাকি! কেন? জীবিকার পরাধীনতার [সামান্য হাসি] স্বাস্থ্যের কারণে? [সামান্য হাসি] পারিবারিক বন্ধন? [সামান্য হাসি] একজন নারীর জন্য? [হাসির সঙ্গে অডাও যোগ দেয়] কিছু পুরনো কবরের জন্য যেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি না? [একটু থেকে] এটা শোন! এটা কি রকম?

অডা □ এটা এক ধরণের পুরনো শব্দের মত যা আমি শুনতাম [একটু থেমে] অন্য সময়ের মত, একই জায়গায়। [একটু থেমে] উন্মত্ত ছিল, জলের ছিটেফোঁটাগুলো আমাদের ওপর উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছিল [একটু

থেমে] অদ্ভুত, তখন তো উন্মত্ত থাকার কথা। [একটু থেমে] আর এখন শান্ত।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ ওঠা যাক, চলো যাই।

অডা ☐ যাবো? কোথায়? আর অডি? ও যদি এসে দেখে তুমি ওকে ছাড়াই চলে গেছ তবে বেচারী বেশ অসুবিধেয় পড়বে [একটু থেমে] ওকে তোমার সঙ্গে রেখেছ একথা মনে করছ নাকি?

পিয়ানো কেসের ওপর সিলিণ্ডার রুলার দিয়ে সাবলীল ভাবে ধাক্কা দেয়। এলোমেলোভাবে, উঠছে নামছে, 'এ ফ্ল্যাট মেজর' স্কেলেতে অডি বাজায়, হাত দুটো প্রথমে একত্রে, তারপর উল্টো।

সামান্য বিরতি।

সঙ্গীত শিক্ষক ☐ [ইতালীয় উচ্চারণে] সাণ্টা সেসিলিয়া।

সামান্য বিরতি।

অডি ☐ আমি অনুগ্রহ করে আমার পিসটা বাজাব?

সামান্য বিরতি।

সঙ্গীত শিক্ষক দুটো বারে ওয়ালজ'র সময়ে রুলার দিয়ে পিয়ানো কেসে টোকা দেয়। অডি চপিন'র ৫ম ওয়ালজে। 'এ' ফ্ল্যাট মেজর ওপেনিং বার বাজায়, সঙ্গীত শিক্ষক অডির বাজনা যেমন বাজায় সেভাবে মৃদুভাবে রুলার দিয়ে সময় ধরে টোকা দেয়। খাদের প্রথম কর্ডে, বার-৫ F এর পরিবর্তে E। পিয়ানো কেসের ওপর রুলারের আঘাতে পুনরায় শব্দ হয়। অডি বাজনা থামায়।

সঙ্গীত শিক্ষক ☐ [রেগে] ফল্স!

অডি ☐ [কাঁদো কাঁদো ভাবে] কি?

সঙ্গীত শিক্ষক ☐ [রেগে] এফ! এফ!

অডি ☐ [কাঁদো কাঁদো ভাবে] কোথায়?

সঙ্গীত শিক্ষক ☐ [রেগে] কুয়া! [নোটের ওপর আঘাত করে] ফল্স!

সামান্য বিরতি।

অডি আবার বাজাতে শুরু করে। সঙ্গীত শিক্ষক রুলার দিয়ে মৃদুভাবে সময় হিসেব করে টোকা দেয়। যখন অডি বার-৫ আসে সে আবার একই ভুল করে। রুলার দিয়ে পিয়ানো কেসে ভয়ানক ভাবে আঘাত করে। আমি বাজনা বন্ধ করে, আবার কাঁদতে শুরু করে।

সঙ্গীত শিক্ষক ☐ [উন্মত্ত রাগে] এফ! এফ! [নোটে টোকা দেয়।] এফ! [নোটে জোরে টোকা দেয়] এফ!

'এফ' এর নোটে জোরে টোকা দিতে থাকে এবং অডি কাঁদতে থাকে। কান্না বাড়তে বাড়তে আক্রমনাত্মক পর্যায়ে ওঠে, তারপর হঠাৎ থেমে যায়।

সামান্য বিরতি।

অডা ☐ আজ তুমি চুপচাপ।

হেনরি ☐ পৃথিবীতে ওকে টেনে আনাটা যথেষ্ট নয়, এখন সে অবশ্যই পিয়ানো বাজাবে।

অডা ☐ ও অবশ্য শিখবে। ও শিখবেই—ওটা—এবং ঘোড়ায় চড়া।

খুরের শব্দ। হেঁটে চলেছে।

রাইডিং মাস্টার ☐ মিস এখন! কুহুই দুটো ভেতরে মিস! হাত দুটো নিচে মিস! [ঘোড়া টগবগ টগবগ করতে থাকে।] মিস এখন! পিঠটা সোজা করে মিস। হাঁটু দুটো ভেতরে [খুরের শব্দ আস্তে আস্তে] এখন মিস! পেটটা ভেতরে মিস! চিবুক তুলে মিস! [খুরের লাফানো শব্দ, লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে] এখন মিস। চোখ দুটো

সামনে! [অডি কাঁদতে শুরু করে] এখন মিস! এখন মিস!

ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে, 'এখন মিস!' আর অডি কাঁদতে থাকে, ক্রমশ কান্না বাড়তে বাড়তে আক্রমনাত্মক হয়ে যায়; তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

সামান্য বিরতি।

অডা ☐ কি ভাবছ তুমি? [একটু থামে] আমাকে কখনো শেখানো হয়নি, এত দেরী হয়ে গেছে যে আর শেখা হল না। সারা-জীবন এর জন্য অনুশোচনা করি।

হেনরি ☐ কোনটাতে যে তুমি পোক্ত, আমি ভুলে গেছি।

অডা ☐ ওহ……আমি মনে করি জিওমেট্রি—প্লেন এণ্ড সলিড। [একটু থেমে] প্রথম প্লেন তারপর সলিড [যেন হেনরি ওঠে এমনই শব্দ হয়] উঠলে কেন?

হেনরি ☐ আমার মনে হল আমি চেষ্টা করতে পারি যতটা জলের ধারে পাওয়া যায় [থামে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে] আর পিঠ [একটু থামে] আমার বুড়ো হাড় টেনে—

সামান্য বিরতি।

অডা ☐ বেশ, কেন তুমি করছ না? [একটু থামে] এ ভেবে ওখানে দাঁড়িয়ো না। (একটু থামে) ওখানে তাকিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ো না। (বিরতি সামান্য। হেনরি সমুদ্রের দিকে যায়। বুটের শব্দ হয়, দশ কদম বলা যায়। সে জলের ধারে থামে। একটু বিরতি। সমুদ্রের শব্দ একটু জোরে হয়। দূরে) তোমার সুন্দর বুটটা ভিজিও না।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ কোর না। কোর না……

সমুদ্র হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

অডা ☐ (কুড়ি বছর আগের মত, অনুনয় করে) কোর না! কোর না!

হেনরি ☐ (কুড়ি বছর আগের মত, চটপট হয়ে) ডার্লিং!

অডা ☐ (কুড়ি বছর আগের মত, আরো ক্ষীণকণ্ঠে) কোর না!

হেনরি ☐ (কুড়ি বছর আগের মত, উল্লসিত হয়ে) ডার্লিং!

সমুদ্র তীব্র হয়। অডা চীৎকার করে ওঠে। চীৎকার ও সমুদ্রের গর্জন ক্রমশ বাড়তে থাকে, থেমে যায়। শেষ হয় স্মৃতির আহ্বান। একটু বিরতি। সমুদ্র শান্ত। থাক থাক সাজানো সমুদ্র সৈকতে ফিরে যায় হেনরি। বেশ পরিশ্রম করে বুট টেনে টেনে চলে তার শব্দ। হেনরি। একটু বিরতি। সে চলতে থাকে। থামে। একটু বিরতি। সমুদ্র শান্ত হয় এবং মিলিয়ে যায়।

অডা ☐ ফাঁক রেখে ওখানে দাঁড়িয়ো না। বোস। (একটু থামে, হেনরির বসার শব্দ।) শালের ওপর। (একটু থেমে) তোমার কি ভয় করছে আমরা তোমাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারি? (একটু থামে।) হেনরি।

হেনরি ☐ হ্যাঁ।

অডা ☐ তোমার কথাবর্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার দেখানো উচিত। অডির পক্ষে এ খারাপ হবেই, তাই না? (একটু থেমে) তুমি জান ও আমাকে একবার কি বলেছে, ও যখন খুবই ছোট, বলেছে, মাম্পি, ড্যাডি কেন সব সময় কথা বলে? তোমাকে পায়খানাতে কথা বলতে শুনেছে ওকে যে কি উত্তর দেব আমার জানা ছিল না।

হেনরি ☐ ড্যাডি! অডি! (একটু থেমে) আমি তোমাকে বলতে বলেছিলাম যে বোলো আমি প্রার্থনা করছিলাম। (একটু থেমে) ঈশ্বরও তাঁর সন্তদের প্রতি জোরালো প্রার্থনা। প্রার্থনার গর্জন।

অডা ☐ শিশুদের পক্ষে এটা খারাপই হত। (একটু থেমে) এটা বলা খুবই বোকামি হত। এটা শুনে তোমার থেকে এ আড়াল করা যেত না। এ কথা শুনেও তোমার কাছ থেকে শুনে ফেলত, এমন কি তোমার এ শোনা উচিৎ নয়,

তোমার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে—এটাই ভাবত।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ তাই! আমার শোনানো উচিৎ হয়নি!

অডা ☐ আমি ভাবিনি এ তুমি শুনছ। আর তুমি যদি শুনে থাক তবে ভুলটা কিসের। এটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ নম্র আরামদায়ক শব্দ, একে তুমি ঘৃণা করছ কেন? (একটু থেমে) আর যদি ঘৃণা করে থাক তবে এ থেকে দূরে সরে থাকছ কেন? তবে কেন তুমি এখানে নিচে নেমে আসছ সবসময়? (একটু থেমে) তোমার মাথায় কিছু গোলমাল আছে, হোলাওয়েকে তোমার দেখানো উচিৎ, সে এখনো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে তো?

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ (ক্রুদ্ধভাবে) ঠকাস, আমি চেয়েছিলাম ঠকাস! এই রকম! সে কিছু খোঁজে, হাতড়ে বেড়ায় তার শব্দ, দুটো বড় পাথর ধরে এবং দুটোকে একত্রে ঠকাঠক করা শুরু করে।) পাথর! (শব্দ করে) পাথর! (শব্দ করে। 'পাথর! ঠকাস ঠকাস শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। একটু বিরতি। সে একটা পাথর দূরে ফেলে দেয় ছুড়ে। পাথর পড়ার শব্দ হয়) ঐ হল জীবন! (সে অন্য পাথরটিও ফেলে দেয় দূরে। পড়ার শব্দ হয়।) এটা নয়— (একটু থেমে——শুষে নেয়!

অডা ☐ আর জীবন কেন? (একটু থেমে) জীবন কেন, হেনরি? (একটু থেমে) কোন একজন সম্পর্কে কি?

হেনরি ☐ জীবিত আত্মার নয়।

অডা ☐ আমি ঠিক এতটাই ভেবেছিলাম। (একটু থামে) যখন এটা আমাদের নিজেদের ভেতর পেতে চেয়েছি ঠিক সেইসময় কেউ না কেউ সেখানে থাকত। সব

সময়। আর এখন জায়গাটা পরিত্যক্ত নির্জন হলেও কিছু যায় আসে না।

হেনরি ☐ হাঁ, তোমাকে সবসময় সুন্দর চটপটে কথাবার্তার ব্যাপারে সচেতন দেখা যেত। ধোঁয়ার পালক দিগন্ত জুড়ে কমই থাকত, আর তুমি পোশাক আশাক বেশ মানিয়ে নিতে, ডুবে যেতে ম্যানচেস্টার গার্ডেনে। (একটু থামে) এখনো ওখানে গর্ত রয়েছে, এইসব দিনগুলোতে (একটু থামে। আরো জোরে) ওখানে এখনো গর্ত।

অডা ☐ কিসের গর্ত? সমস্ত পৃথিবীটাই তো গর্তে ভরা।

হেনরি ☐ অবশেষে প্রথম আমরা কোথায় করেছিলাম।

অডা ☐ অ, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে মনে পড়ছে (একটু থেমে) জায়গাটা বদলায় নি।

হেনরি ☐ ও হ্যাঁ বদল হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি (দৃঢ়তার সঙ্গে) সমান করা শুরু হয়েছে। (একটু থেমে) ওর কত বয়স হয়েছে এখন?

অডা ☐ সময় হিসেব করা ভুলে গিয়েছি।

হেনরি ☐ বারো? তেরো? (একটু থেমে) চোদ্দো?

অডা ☐ আমি সত্যি তোমাকে বলতে পারছি না, হেনরি।

হেনরি ☐ ওকে পেতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল। (একটু থেমে) বছরের পর বছর চেষ্টা করা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম (একটু থেমে) শেষে আমরা করলাম। (থামে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) শেষে ওকে পেলাম (একটু থেমে) এটা শোন! এর থেকে যখন তুমি বেরিয়ে গেলে সেটা ততটা খারাপ হয়নি (একটু থেমে) সম্ভবত মার্চেন্ট নেভিতে যাওয়াটাই উচিত ছিল।

অডা ☐ এ শুধু বাইরের দিক তুমি ভালই জান। নিচে সব কিছুই কবরের মত শান্ত। কোন শব্দ নেই। সারাদিন, সারারাত, কোন শব্দ নেই।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ এখন আমি গ্রামাফোন নিয়ে হেঁটে বেড়াই। কিন্তু আজ ভুলে গেছি।

অডা ☐ ওতে কোন বোধই ছিল না। (একটু থেমে) ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করার মত বোধই ছিল না। (একটু থেমে) হোলোওরেকে দেখ।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ চল আমরা নৌকো চালাই।

অডা ☐ নৌকো? আর অডি? ও যদি এসে দেখে তুমি ওকে ছাড়াই নৌকো বাইতে গিয়েছ তবে ও বড় কষ্ট পাবে। (একটু থেমে) এই মাত্র তোমার সঙ্গে কে ছিল? (একটু থেমে) আমার সঙ্গে কথা বলার আগে।

হেনরি ☐ আমি আমার বাবার সঙ্গে থাকবার চেষ্টা করছিলাম।

আডা ☐ ওহ। (একটু থেমে) ও ব্যাপারে কোন অসুবিধে নেই।

হেনরি ☐ মানে ওকে আমার সঙ্গে পাবার চেষ্টা করছিলাম। (একটু থেমে) অডা আজ তোমাকে সাধারণত যা দেখা যায় তার চেয়ে সামান্য কচি লাগছে (একটু থেকে) আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম ওর সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছিল, আমি মনে করতে পারিনি।

অডা ☐ আচ্ছা?

হেনরি ☐ আমায় সে উত্তর দেয়নি।

অডা ☐ আমি মনে করি ওকে তুমি ক্লান্ত করে তুলেছ। (একটু থেমে) তুমি জীবিত অবস্থায় ক্লান্ত করেছ ওকে তুমি মৃত করে তুলছ। (একটু থেমে) এমন এক সময় আসবে যখন তোমার সঙ্গে আর কেউ কোন কথা বলবে না। (একটু থেমে) সময় আসবে যখন তোমার সঙ্গে আদৌ কেউ কথা বলবে না, এমন কি একজন অপরিচিত ব্যক্তিও কথা বলবে না। (একটু থেমে) তোমার কথা নিয়ে তুমি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বে, অন্য কোন কণ্ঠস্বর জগতে

আর থাকবে না। শুধু তোমারটি ছাড়া। (একটু থেমে) আমার কথা শুনছ?

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ আমি মনে করতে পারছি না ওর তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা।

অডা ☐ তুমি জান তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

হেনরি ☐ না, অডা, আমি জানি না, দুঃখিত, তোমার সঙ্গে সবকিছুর যোগ ছিল, সেসব আমি প্রায় ভুলেই গেছি।

অডা ☐ তুমি সেখানে ছিলে না। শুধুমাত্র তোমার মা ও বোন। তোমাকে আমার জন্য, ব্যবস্থা অনুযায়ী তোমাকে আনা হয়েছে। আমাদের একত্রে স্নান করতে যেতে হবে।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ (উত্তেজিত হয়ে) চালাও, চালিয়ে যাও! কেন যে লোকেরা সবসময় কথার মাঝখানে থেমে যায়?

অডা ☐ তাদের কেউ জানে না কোথায় তুমি ছিলে। তোমার বিছানায় কেউ ঘুমোয় না। একজন আরেকজনের সঙ্গে চীৎকার করে। তোমার বোন বলে ছিলো খাড়ির উপর থেকে সে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলবে। তোমার বাবা উঠলেন, তারপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আমি শিগ্রি পেছন পেছন বেরুলাম, ওকে পেরিয়ে গেলাম। উনি আমাকে দেখেন নি। পাথরের ওপরে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি কখনো সে ভঙ্গিটি ভুলব না। যদিও তা সাধারণই ছিল। মাঝে মাঝে তুমি সেভাবে বস। সম্ভবত এত স্থির ভাবে বসে-ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন পাথর হয়ে যাবেন। আমি আর কখনো খুঁজে পাব না।

সামান্য বিরতি।

হেনরি ☐ বলে যাও, বলে যাও! (অনুনয় করে) বলে যাও, বলে যাও অডা, প্রত্যেকটি উচ্চারণই একটি সেকেণ্ড লাভ হয়।

অডা। এই হচ্ছে ব্যাপার আমি ভয় পাচ্ছি। (একটু থেমে) এখন যদি তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বা তোমার গল্পগুলোর সঙ্গে বা তুমি যা করছিলে তা চালিয়ে যাও; আমাকে নিয়ে কিছু ভেব না।

হেনরি আমি পারি না। (একটু থেমে) আমি আর এটা করতে পারি না।

অডা এক মুহূর্তে আগেও তুমি তা করছিলে, আমার সঙ্গে কথা বলার আগে।

হেনরি (রেগে) এখন আর একটুও করতে পারি না। (একটু থেমে) ক্রাইস্ট।

সামান্য বিরতি।

অডা হ্যাঁ; তুমি জান আমি কি বলতে চাইছি, যুক্তি হিসেবে একজনের মনে কিছু স্পষ্ট ধারণা থাকে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি মাথার চালনা, একজন যখন ভাবে এটি ওপরে তুলতে হবে তখন সে মাথাটা নিচু করে, আবার যখন নামাবে ভাবে তখন উল্টোটা করে, অথবা হাতদুটো ছেড়ে দেয় শূন্যে, ভাসিয়ে দেয় বাতাসে, যেন নিজের থেকে মুক্ত করে দিল। বস্তুত তেমনি। কিন্তু সেদিন তোমার বাবা পাথরের ওপর তোমার সঙ্গে বসে, তুমি তা স্পষ্ট ভাবে কোন কিছু বোঝাতে পারনি তার বল, কী অদ্ভুত, বড় অদ্ভুত। না, আমি এসব বুঝে উঠতে পারি না। সম্ভবত, আমি এটা বলেছিলাম, সমস্ত শরীরের নিথর মূর্তিটি, যেন সমস্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে গ্যালো। (একটু থেমে) হেনরি, এই বাজে জিনিস কি তোমাকে সাহায্য করবে? (একটু থেমে) আমি চেষ্টা করতে পারি, আর তুমি যদি চাও আমি আরেকটু। (একটু থেমে) তাই না? (একটু থেমে) তারপর আমি মনে করি আমি ফিরে আসব।

হেনরি এখনো নয়। তোমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। শুধু শোন। এখন নয়। আমার সঙ্গে থাকো। (একটু থেমে) অডা। (একটু থামে। আরো জোরে) অডা। (একটু থেমে) ক্রাইস্ট। (একটু থেমে) খুরের শব্দ। (একটু থামে। জোরে) খুরের শব্দ। (একটু থেমে) ক্রাইস্ট। (দীর্ঘ বিরতি) পরে তাড়াতাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল, রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে'ছলে ওকে দেখোনি, বাইরে খুঁজেছ—(একটু থেমে) সমুদ্রে খুঁজে পেতে দেখতে পারোনি (একটু থেমে) অন্য দিকে অকারণ তুমি খুঁজে বেরিয়েছ। বৃথাই তুমি খাঁড়ির দিকে খুঁজেছ? (একটু থেমে) বাবা। (একটু থেমে) তুমি অবশ্যই খুঁজে পাবে আমি মনে করি। (একটু থেমে) ও তোমাকে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, তারপর ট্রামে নিচের পথ ধরে গেছে, ওপরটা খুলে ওপরে গেছে, বসে পড়ে সামনে। (একটু থামে) সামনে বসে। (একটু থেমে) হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে, আবার নেমে যায়, কণ্ডাক্টর: মিস আপনি কি মত পাল্টে ফেললেন? পথ ধরে পিছনে ফিরে আসে, তোমার কোন চিহ্নই নেই (একটু থেমে) অত্যন্ত বিমর্ষ এবং আর অস্বস্তিতের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে কোন, জন্তুপ্রাণী নেই, সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে, পথ বেয়ে নেমে যায়, ট্রাম ধরে বাড়ি আসে (একটু থেমে) ট্রাম ধরে বাড়িতে। (একটু থেমে) ক্রাইস্ট। (একটু থেমে) 'আমার প্রিয় বোল্টন—' (একটু থেমে) যদি তুমি একটা ইনজেকশান চাও, বোল্টন, তবে ট্রাউজার তোল, আমি তোমাকে একটা দেব, নটার সময় আমার একটা প্যানহিস্টারেক্টমি আছে, এর মানে অবশ্যই এনাস্থেশীয়। (একটু থেমে) আগুন নিভে গেছে, তীব্র ঠাণ্ডা, সাদা জগৎ, বড় অস্বস্তি, কোন শব্দ নেই। (একটু থেমে) বোল্টন পর্দা নিয়ে খেলা শুরু করে, না, পর্দা, বর্ণনা করা কষ্ট কর, পেছনে টানে, না, তার দিকে একধরণের জমায়েত করা আর চাঁদ বন্যার মত ভেতরে ঢুকছে, তারপর পেছনে পড়তে দেয়, দারুন মর্মমলীয় ব্যাপার এবং পাঁচ কালো ঘরে, তারপর তার দিকে আবার, সাদা, কালো, সাদা, কালো, হোলোওয়ে: 'ঈশ্বরের ভালবাসায় এ বন্ধ কর বোল্টন, তুমি কি আমায় শেষ করে দিতে চাও?' (একটু থেমে) কালো, সাদা, কালো, সাদা, পাগলামোর বস্ত্র। (একটু থেমে) তারপর সে হঠাৎ দেশলাই জালে, বোল্টন জালে, মোমবাতি জালায়, এটা মাথার ওপর তুলে ধরে, হাঁটে বিনা বাধায়, পুরো দৃষ্টি নিয়ে হোলোওয়ের দিকে

তাকায়। (একটু থেমে) কোন কথা নয়, শুধুমাত্র চাহনি, নীল বুড়ো চোখ, কাচের মত অতি স্বচ্ছ, পাতলা চোখের পাতা, চোখের রোম উঠে গেছে, সমগ্র জিনিসটা সাঁতার কাটছে, তার মাথার ওপর মোমবাতির ধোঁয়া ছাড়ছে (একটু থামে) চোখের জল? (একটু থেমে। দীর্ঘ হাসি) মঙ্গলময় ঈশ্বর নয়। (একটু থামে) একটি শব্দকে কথা নয়, শুধুমাত্র চাহনি, নীল বুড়ো চোখ, হলওয়ে, 'তুমি যদি একটা শট চাও তাহলে বল, আর আমাকে এই নরক থেকে বেরুতে দাও।' (একটু থেমে) 'এর আগেও আমরা এ ভোগ করেছি বোল্টন, আমাকে আবার এ দেখতে বোলো না।' (একটু থেমে) বোল্টন: 'প্লিজ!' (একটু থেমে) 'প্লিজ!' (একটু থেমে) 'প্লিজ হোলোওয়ে!' (একটু থেমে) মোমবাতির শিখা কাঁপতে থাকে, আর সমস্ত জায়গা জুড়ে গলে গলে পড়ছে। এখন কিছুটা নিচে, বুড়ো হাত ক্লান্ত, অন্য হাতে সে নেয়, আবার মোমবাতি উঁচুতে তুলে ধরে। ঐযে, ঐ রকম সবসময়ই ছিল, রাত্রি, আর জলন্ত কয়লা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তোমার বুড়ো মুঠিতে আলোর ফুলকি কাঁপছে, বলছে, প্লিজ! প্লিজ! (একটু থেমে) প্রার্থনা করছে। (একটু থেমে) বেচারার। (একটু থেমে) অডা! (একটু থেমে) বাবা! (একটু থেমে) ক্রাইস্ট! (একটু থেমে) আবার এটা উঁচুতে ধরে, চুপ্ পৃথিবী, হোলোওয়েকে স্থির ভাবে রাখে, চোখ দুটো ডুবে যায়, আবার জিজ্ঞেস করে না, শুধু মাত্র চাহনি, হোলোওয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলে, কোন শব্দ নেই, তীব্র ঠাণ্ডা, নারকীয় দৃশ্য, বুড়ো লোকদুটো, বড় কষ্ট, কোন মঙ্গল নেই। (একটু থেমে) ক্রাইস্ট! (একটু থামে। যেন সে ওঠে এরকম শব্দ হয়। সে সমুদ্রের দিকে যায়। বুটের শব্দ হয়। জলের কিনারা এসে সে থামে। একটু শব্দহীন সময়। সমুদ্রের শব্দ একটু বাড়ে) ছোট্ট বই। (একটু থামে) এই সন্ধ্যা—(একটু থামে) কিছু নেই এই সন্ধেতে (একটু থামে) আগামীকাল—আগামী কাল—নটার সময় মাপা হয়, তারপর কিছু নেই। (একটু থামে, বিমূঢ়) নটার সময় মাপা হবে? (একটু থেমে) অহ হ্যাঁ, নষ্ট। (একটু থামে) শব্দগুলো (words) (একটু থেমে) শনিবার—কিছু নেই। রবিবার—রবিবার—সারাদিন কিছু নয়। (একটু থেমে) কিছু নেই, কিছু নেই সারাদিন। (একটু থেমে) সারা দিন সারা রাত কিছু নয়। (একটু থেমে) কোন শব্দ নেই।

ভাষান্তর: মনোজ চাকলাদার

স্বপন হালদার

ঈশ্বরের মন

পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই ইশ্বরে বিশ্বাসী। অগ্রগতির সঙ্গে এই সংখ্যাটার খুব বেশী হেরফের হয়নি যা হয়েছে তা হচ্ছে ধর্ম (Religion) সম্পর্কে অনাসক্তি। আমরা এটাকেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস বলে ধরে নিই। কিন্তু পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ ইশ্বর-বিশ্বাসী এই সহজ গাণিতিক নিয়মে প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা। অসুবিধা এখানেই যে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাদের বিশেষ দায় নেই ঈশ্বর আছেন এটা প্রমাণ করার। প্রকৃতপক্ষে এর দায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের। এরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছেন "ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত" বলে মানুষ যা বিশ্বাস করে এসেছেন তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব খর্ব করার। কিন্তু এ পদ্ধতিও বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

যদিও বিজ্ঞানই ঈশ্বরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তা সত্ত্বেও দেখা যায় বিজ্ঞানীদের বেশীর ভাগ অংশটাই হয় এ সম্পর্কে উদাসীন বা আস্তিক, এই সমস্ত ব্যক্তিরা বিজ্ঞান ও ঈশ্বর দুটোয় সমান বিশ্বাসী। ঐ সমস্ত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দিকটাই বোঝেন কিন্তু বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকটি বোঝেন না বা বুঝলেও সংঘাত এড়িয়ে চলেন। ঈশ্বরবাদীদের যেমন সবচেয়ে বড় ভুল বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে যাওয়ার মধ্যে তেমনি বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বড় ভুল বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে না ধরার মধ্যে।

পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির পর থেকে আমরা যদি বিজ্ঞানের ইতিহাসের অর্থাৎ বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারের দিকে তাকাই সবাই দেখতে পাব মনুষ্য ইতিহাসের প্রথমদিক বা আদিম সাম্যবাদী সমাজ যুগে বিজ্ঞান যে দ্রুততায় বিকাশ লাভ করে তুলনায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ইতিহাস যেন থেমে ছিল। এর পরবর্তীতে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের

পর থেকে বিজ্ঞান দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় আদিম সাম্যবাদী সমাজেও মানুষ যে মুক্তমনের অধিকারী ছিল সেই অধিকার ক্রমশঃ ছিনিয়ে নেয় ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ধজাধারী ধর্ম। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এই বিশাল সময়কালে বিজ্ঞানের প্রায় বন্ধ্যা অবস্থা। এর পরে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। সময়কালটা ধরা যায় গ্যালিলিওর সময় থেকেই। এর আ.গ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কার যা বৈজ্ঞানিক তত্ব ছিল ধারণাভিত্তিক এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য রেখা ছিলো না যে অ্যারিষ্টলই হোন বা দার্শনিক প্লেটোই হোন। গ্যালিলিওই প্রথম বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছানোর নীতিকেই সঠিক নীতি বলে মনে করেন। এবং এখনও পর্যন্ত এটাই বিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতি। এর থেকে বিজ্ঞান স্বয়ং আইনস্টাইনকেও রেহাই দেন নি। যুগান্তকারী আপেক্ষিকতা তত্বকেও পর্যন্ত স্বীকৃতি আদায় করতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যন্ত। বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের যুগেও ঈশ্বর বিশ্বাসী জড়মন ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনের সংঘাত ছিল এবং এখনও আছে। যে গ্যালিলিও ঈশ্বর বিশ্বাসী ক্যাথলিকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কুঠারঘাত করেন এই মতবাদ প্রচার করে: বিশ্বের ক্রিয়াকর্ম বোঝার আশা মানুষের রয়েছে এবং কোপার নিকাসের তত্ব: পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে" সেই গ্যালিলিওই আবার ঈশ্বরে ঘোর বিশ্বাসীও ছিলেন। কেপলার কোপার নিকাস গ্যালিলিও মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে যত সঠিক তথ্যই হাজির করুন না কেন এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রক হিসাবে বা বিশ্বসৃষ্টির কারণ হিসাবে ঈশ্বরকেই মেনে নিয়েছিলেন। সেই অর্থে যুগান্তকারী গতিসূত্র এবং মহাকর্ষসূত্রের আবিষ্কর্তা স্যার আইজ্যাক নিউটনও ঈশ্বরবাদী ছিলেন যা তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রের সঙ্গে মোটেই অসংগতি পূর্ণ ছিল না। এই বিশ্বের সমস্ত বস্তুরাশির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা নিউটন হাজির করলেও এই বর্তমান অবস্থানে পৌছানোর জন্য যে প্রাথমিক শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা তিনি হাজির করতে পারেন নি বা তিনি হয়ত এই প্রাথমিক শক্তির উৎস হিসাবে ঈশ্বর নেই মানতেন। বিজ্ঞানী লাপ্লাস যিনি নিমিত্তবাদ (determinism) দর্শনের উদগাতা তিনি মনে করলেন যে কোন বস্তুর বেগ, অবস্থান এবং সময় জানতে পারলেই ঐ বস্তুর বর্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যত নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু তিনিও তার এই তত্ত্বের

সাহায্যে প্রাথমিক শক্তির কোন ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেন নি। তাছাড়া পরবর্তিকালে বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তাবাদ (uncertainty principle) তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করেন কখনই একই সঙ্গে সঠিকভাবে কোন বস্তুর বেগ এবং অবস্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। সুতরাং নিরিশ্বরবাদীদের প্রধান অস্ত্র নিমিত্তবাদ অনেকটাই ভোঁতা হয়ে যায় এই তত্ব আবিষ্কার ও প্রমাণের পরে। কিন্তু তা সত্বেও এটা প্রমাণিত যে এই বিশ্বের সমস্ত ঘটনাবলী কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মেই চলে যদিও তা আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্র অনুযায়ি এই বিশ্বের কোনও কিছুই চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট নয়, যে কোন ঘটনা (Event) তার পারিপার্শ্বিক অন্য ঘটনা বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আবার আপেক্ষিকতা তত্বও পুরোপুরি আপেক্ষিক নয় নয় কারণ এই তত্ত্বের কোন একটি বিশেষ সময়ে স্থানকাল সীমাবদ্ধ এবং আলোক গতিবেগ সব পরিস্থিতিতেই চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা বৃহৎ বিস্ফোরন (Big Bang) তত্ব নামে পরিচিত। বিশ্ব সৃষ্টির এই তত্ব এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীমহলে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও বিশ্বসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব হিসাবে স্বীকৃত। এই তত্ত্বের মতে অসীম ঘনত্বের একটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে এই বিশ্বের সমস্ত ভর সঞ্চিত ছিল যা আবার আভ্যন্তরীন মাধ্যাকর্ষণের জন্য ক্রমাগত সঙ্কুচিত হ'তে থকেে এবং ক্রমশঃ তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় বিশাল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। এই বিস্ফোরণের ফলে ঘনীভূত সমস্ত বস্তুপিণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে। এই তত্ব অনুযায়ি বিশ্বের সমস্ত বস্তুরাশি পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে যদি না বিশ্বের ভর সঙ্কট ভর (critical mass) অপেক্ষা বেশী হয়। যদি বিশ্বের মোট ভর সঙ্কট ভর অপেক্ষা বেশী হয় তবে একটা সময় পরে বিশ্ব সঙ্কুচিত হতে সুরু করবে এবং বৃহৎ বিস্ফোরনের ঠিক বিপরীত অবস্থা বৃহৎ সঙ্কোচন (Big crunch) হবে। তবে আশার কথা এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মোট যে ভর গণনা করেছেন তা সঙ্কট ভর অপেক্ষা কম ফলে সঙ্কোচন হওয়ার সম্ভাবনা আপাততঃ নেই। তবে বিগ ব্যাং তত্বে বিশ্ব সৃষ্টির আগে বিশ্বের কি অবস্থা ছিল তা জানা কোন ভাবেই সম্ভব নয় কারণ চূড়ান্ত ঘনীভূত অবস্থায় এই বিশ্বে প্রচলিত কোন সূত্রই কার্যকর নয় এবং ঐ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অপারগ। তাছাড়া বিগ ব্যাং তত্বের সমর্থকদের মতে স্থান ও

কালের শুরু বিগ ব্যাং-এর সময় থেকেই এবং স্থান ও কালের শেষে বিগ ক্রাঞ্চে। তাই যদি হয় তবে বর্তমানে আমাদের জানা সমস্ত সূত্র শুধুমাত্র এই মধ্যবর্তী অবস্থাকেই ব্যাখ্যা করতে পারে তার আগের বা পরের অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য কি আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন? ঈশ্বর বিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলেন ঈশ্বর একগুচ্ছ সূত্রসমেত এই বিশ্ব তৈরী করেছেন যে সূত্রগুলি দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ কিনা এই বিশ্বে সমস্ত কিছুই ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত। গ্যালিলিওকে স্বীকৃতি দেওয়ার দশ বছর আগে ১৯৮১ সালে পোপ জন পল ভাটিকান সিটিতে বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন বিশ্বতত্ত্ব আলোচনার জন্য। তিনি ঐ সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেন তারা যেন বিশ্বসৃষ্টির পরের ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন তার আগের অবস্থার জন্য মাথা না ঘামান, কারণ তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে এটা বুঝেছিলেন যে সময়টা গ্যালিলিওর যুগ থেকে অনেক এগিয়ে গেছে—এখন আর বিজ্ঞানীদের উপর জোর খাটিয়ে বিজ্ঞানীদের গৃহ বন্দী করে তাদের মতবাদকে আটকাতে যাওয়ার চেষ্টা করা বোকামী বরং যদি এদের বুঝিয়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কে আস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। উনি এটা বুঝেছিলেন এখন মানুষ ঈশ্বর, ধর্ম বা যে কোন ধরনের দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানকে অনেক বেশী সত্য বলে মনে করে। এরই ফলশ্রুতিতে যে কোন কিছুকেই বিজ্ঞানের প্রেক্ষতে বিচার করেই সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু ধর্মগুরুদের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঈশ্বর সম্পর্কে নূতন করে ভাবার সময় এসে গেছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম তত্ত্বের মিলনে যে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন তাতে এই বিশ্বের কোন সৃষ্টি নেই কোন ধ্বংস নেই এবং বিশ্ব নিজের মধ্যেই নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন আর নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্ব বা আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অঙ্ক বিশ্লেষণ না জানলেও সাধারণ মানুষ তার দার্শনিক দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে চেষ্টা করে চলেছেন কিভাবে সমস্ত বিশ্ব চালিকা শক্তির সূত্রগুলিকে একটি সাধারণ সূত্রে সূত্রবদ্ধ রাখা যায়। এটা যদি সম্ভব হয় তবে ষ্টিফেন হকিং-এর কথা অনুযায়ী সমস্ত সাধারণ মানুষই দার্শনিক হয়ে উঠবে এবং এই তত্ত্বের সমালোচক ও বিশ্লেষক হয়ে উঠবে। ফলে আমরা সকলেই বিশ্ব সৃষ্টির গূঢ়রহস্য জানতে পারব অর্থাৎ আমরা তখন ঈশ্বরের মন জানতে পারব।

মনীষা ব্যানার্জি

প্রকৃতপক্ষে, একজন যা লক্ষ্য করে

চশমার কাঁচটা মুছতে মুছতে সে তাকালো দূরদর্শনের পর্দার দিকে, পর্দার ফাঁকে দৃশ্যমান অব্যবহৃত উনুনের দিকে, দেওয়ালে ঝুলন্ত বেল্টের দিকে, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়ালের দিকে। বলতে পারবে না, কি সে প্রকৃতপক্ষে দেখছিলো, কোনওদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে, ঘাড় ঘোরাতে ক্লান্ত বোধ হয়, এই ঘরে ঠাকুরের সিংহাসন ও শিশুর খেলনা সমার্থক। স্বামী ও পিতা সমার্থক, গ্রন্থ ও আলো সমার্থক। তার পিছনদিকে যে চিত্র কাঠের ফ্রেমে বাঁধান, তা এক কাল্পনিক প্রতিকৃতির। কে এমন কল্পনা করল! পটুয়া না পূজারী? শিল্পী না ব্যবসাদার? একটা অতি শুষ্ক জবা ফুলের মালা ঐ ফ্রেমে ঝুলছে।

ওগুলোকে কি বেঞ্চ বলব? তিনজন বসে আছে হেলান দিয়ে। দু-জন কাছাকাছি, একজন একটু ব্যবধানে। ছেড়ে গাছের কাটা গুঁড়িটার উপর বসলাম। ওর হাতল, ওর পাঠাতন, ও পিঠের দিকের হেলান অংশটুকু কাঠের, ওগুলো কি এই গাছের! এটা কি গাছ আমি জানি না। গুঁড়ি দেখে কি গাছ চেনা যায়? এতদিন আমি ফুল, ফল, পাতা দেখে গাছ চিনে এসেছি। তারপর তাকিয়েছি কাণ্ডের দিকে, এখন থেকে কি গুড়ি থেকে দেখা আরম্ভ করব? কাঠগুলো যে গাছেরই হোক, তা যদি একাধিক গাছেরও হয়, তা পরস্পরভাবে যা দিয়ে জোড়া লাগান আছে, তা লোহার নাট-বোল্টগুলো যেখানে তৈরী, সেখানে কি লোহার আরও কিছু তৈরী হয়? সেই কারখানার দরজাটা কি এই গাছের কাঠটা দিয়েই তৈরী হয়েছে? সেই কারখানার যারা শ্রমিক তারা কখনও এই চেয়ারটায় বসেছে? বা সেখানকার যে মালিক!

এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে লক্ষ্য করি, মাঠের একধারে খাঁকি পোষাক পরা কয়েকজন মাঝবয়সী অপরিচিত লোক সার হয়ে বসে পরিচিত কিছু ফুলের গাছ লাগাচ্ছে। মনে হল এখানকার সৌন্দর্যের জাদুটা আসলে ওদেরই হাতে। সুন্দর সুন্দর ফুল এতদিন আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু সেগুলো যে হাতে তৈরী সেই হাত কেমন দেখতে, কোমল না কঠিন, ভেবে দেখিনি গভীরভাবে। আচ্ছা, ওরা যে গাছ লাগিয়ে জায়গাটাকে এত সুন্দর করে তুলছে, ওদের নিজেদের বাসস্থান কি নানান গাছ-গাছালির মাঝখানে? নাকি শহরের ধারের কোন ঘিঞ্জি বস্তিতে? সেখানে একটিও গাছ আছে কি?

এক টুকরোও ঘাস অপর্যাপ্ত অক্সিজেন। এরা কি কোনওদিন এদের প্রেমিকাকে এর থেকে একটি ফুল উপহার দেয়? যদিও এর থেকে কিছু ফুল বাজারে যাবে! তাদের জন্য, যারা এগুলো উপহার দেওয়ার জন্যই কিনবে। যে উপহার হিসেবে পাবে তাদের কারও সঙ্গে রাস্তায় অথবা বাসে কখনও কোথাও হয়ত দেখা হয়ে যাবে এই মালিদের। তারা কি তখন চিনতে পারবে পরস্পরকে? আমি তখন কোথায় থাকব?

এই ভাবনাটা চলতে চলতেই চোখটা চলে গেছে অনেকগুলো শিশুর দিকে। নিজেদের মধ্যে কি যেন খেলছে। এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে আর প্রাণ খুলে হাসছে। দূর থেকে মনে হয় বোধহয় মারপিঠ করছে, কাছে আসতে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল এটা আসলে একটা খেলাই, না হলে এমন নির্মল হাসি হাসা যায় না। একজনের গায়ে সোয়েটার বা পায়ে মোজা নেই। কিন্তু সেদিকে এদের কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই। নিজেদের নিয়েই নিজেরা কেমন মগ্ন, এটাই কি মুগ্ধ করছে! নিজের অজান্তেই আমার মুখটাও হয়ত হাসি হাসি হয়ে উঠেছে। একটু ব্যবধানে আরও দুটো শিশু, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা। যার যার মায়ের সঙ্গে এসেছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ঐ শিশুগুলোর দিকে। চোখ মেলে মনে হয় তারা মিশে যেতে চায় ওদের সঙ্গে। 'যাও, বন্ধুকে ডেকে আনো' শুনে ফিরে তাকাল, এক মা তার শিশুটিকে নির্দেশ করছে, অন্য পরিচ্ছন্ন শিশুটিকে দেখিয়ে। ম্লান হয়ে গেল শিশুটি। তা কি এই ভেবে যে অতগুলো আনন্দোচ্ছল শিশুদের একজনও ওর বন্ধু নয়! ও কি নিজেকে সংখ্যায় কম মনে করে ভীত হল! কি ওকে মুগ্ধ করেছিল ওদের সংখ্যা না ওদের স্বতস্ফূর্ততা?

ওদের সকলের অজান্তেই যে আমি ওদের লক্ষ্য করছি; ওরাও কি আমার অজান্তে আমাকে লক্ষ্য করছে? আমার এই ধারণাগুলো যে কলমটা দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি, যে এই কলমটা বানিয়েছে সে কি কখনও পড়বে! সন্ধ্যে নেমে আসছে। সকলে ফিরে যাবে একে একে! আমিও উঠে পড়ব এই গাছের গুড়টার উপর থেকে, পরে আরও অনেকে হয়ত বসবে, তারা কেমন করে চিন্তা করবে জানি না। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে রাস্তায়, তারপর একসময় কোন একটা বাস ধরে ফিরে যাব সেইখানে, যেখান থেকে কোনও গন্তব্যস্থলে কোনওদিন পৌছান যাবে না।

প্রসঙ্গঃ বাড়ি

বাইরে তখন চড়চড় করছে পশ্চিমের আলো কিন্তু তার বাড়িটা অন্ধকার। ভাল করে কিছু নিরীক্ষণ করতে গেলে বিদ্যুতের সাহায্য নিতে হয়। সকাল-বেলায় সামনেটায় পূর্বদিকের আলো এসে পড়ে, কিন্তু অন্দরে প্রবেশ করে না। অনেকগুলো ঘরের, মাত্র একটি থেকেই উলটো এল আকৃতির একটা আকাশের টুকরো, ক্যাম্প খাটে শুয়ে দেখা যায়। যা দেখে শরৎ, গ্রীষ্ম বা শীতকাল কিছুই উপলব্ধি করা যায় না, শুধু বর্ষা ছাড়া। তখন অবশ্য আকাশের দিকে তাকাতে তার ভাল লাগে না, গাছের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে; পাতাগুলো কেমন অদ্ভুত সবুজ হয়ে ওঠে, খটখটে কাণ্ডটা ভিজে শেওলা ধরা হয়ে যায়। আর ভাল লাগে জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে, চোখের সামনে কেমন ভর্তি হতে হতে কানায় কানায় হয়ে যায়! তার মনে হয় এই বর্ষার আগে যদি পুরনো নোংরা জলটাকে কেউ তুলে ফেলে পুকুরটাকে খটখটে করে দিত!

এগুলো ঐ বাড়ি থেকে দেখা যায় না, সেইজন্য একটা অন্য বাড়ি অনুসন্ধান করছে। যদিও জানে সেখান থেকেও এগুলোর কোনটাই হয়ত দেখা যাবে না। কোনও বাড়ি যখন তৈরী হয়, কম বেশী সমস্তরকম সম্ভাবনাগুলো রেখেই তাকে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু একসময় দেখা যায় চারিদিক বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ অন্যান্য বাড়ির উপস্থিতি। তারা তাদের নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে চারিদিকের সম্ভাবনাগুলোকে এমনভাবে মেরে দেয় যে দেখলে মনে হয় কোনও কালে কিছুই ছিলই না!

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

পাঠক কি কি খায়

কথাটা চালু হয়ে গেছে, 'পাঠক খেয়েছে'। পাঠক খেলেই একজন মানুষ শিল্পী বা সাহিত্যিক হতে পারেন। যাকে যতমাত্রায় 'পাঠকখাবে' তিনি ততবড় শিল্পী বা সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত দরবারে পাঠক খাওয়ার জন্য বা পাঠকপাচ্য সাহিত্য পরিবেশিত হওয়ার ফলে 'মান' উঠছে অথবা নামছে—এ আমার বিচার্য নয়। উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার যে এত প্রচার বিশ্লেষণ, পুরস্কার এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্য কেন পাঠককে খাচ্ছে না।

আমাদের পূর্বজরা সংস্কৃত, মৈথিলী বা বাংলা যে ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করে থাকুন না কেন, তাঁদের সাহিত্য পাঠককে খেয়েছে। তাঁদের সাহিত্য ভোজ্য হিসাবে নির্মিত হয় নি। জীবন চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের থেকে ভিন্নরুচির ছিলেন। জীবন অনুশাসনের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত

বিধি নিষেধ আমরা সরল করতে করতে প্রথমত কোন কথায় বা বস্তুতে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি। দ্বিতীয়ত সরলীকৃত হওয়ার ফলে জীবনের উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে এগোন যাচ্ছে না। ক্রমশঃ পিছনে হটতে হচ্ছে। এমতঅবস্থায় আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তবু আমাদের ভুল স্বীকার করতে ভয় হচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে। আমরা সবাই বলছি, ভাল আছি।

আমাদের পূর্বজরা কি বোকা ছিলেন? এই প্রসঙ্গে আমার কারণ তাঁদের জীবন চর্চার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা (?) ঝেড়ে ফেলে আমরা প্রগতিশীল হয়েছি। অথচ তাদের দ্বারা নির্মিত সাহিত্য কর্ম যে আমাদের বোধগম্যের একটু উপরে সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না! তাঁরা বলতেন, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং মা কুরু"! শুধুমাত্র রসিকদের সাহিত্য নির্যাণ হত বলেই, শিল্প সাহিত্যের দ্বারা "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" সম্ভব হত না। পাঠক খেতে পারে এ জাতীয় কোন রস তারা জাল দিতেন না। তাই বোধ হয় পাঠক সাহিত্যে ডুবে যেত, চুমুক দিয়ে পান করতে পারত না।

খাদ্য এবং খাদকের এই স্থান পরিবর্তন, দাবা খেলায় যাকে 'ক্যাসেল' বলা হয়। তার ফলে আমরা মূল ধারার পরিবর্তন ও লক্ষ্য করেছি। সে দিন থেকে আমজন তার জন্য সাহিত্য নির্মান শুরু হল। পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশকের গদি আমজনতার সাহিত্যে ঢাকা পড়ে গেল। আমরা হারিয়ে ফেললাম মূলধারা কে। বাজারের ধারা বা বটতলার সাহিত্য আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যের মূলধারায় পর্যবসিত হল।

শিক্ষার হার বেড়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার এবার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে। মানুষের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগ বেড়েছে। প্রতি যোগিতা বেড়েছে। তাসত্বেও বই বিক্রী বাড়েনি। (পুস্তক মেলার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়। বাংলা বই-এর তুলনায় ইংরাজি বই অনেকগুণ বেশি বিক্রী হয়।) সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। বই-এর ব্যবসা করতে গেলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

পড়তে জানা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও বাজার বাড়েনি। পাঠক খাবে বলে যা তৈরী হচ্ছে পাঠক খাচ্ছেনা। কেন? সাহিত্য পাঠক পাচ্য

হবে—এই তত্ত্বটা কি ভুল ছিল? ভুল থাকুক অথবা ঠিক থাকুক—এই পথ লেখকের কাছে দুটো কারণে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ লেখা চাইলেই বা লিখতে চাইলেই লেখা হয়ে যাচ্ছে। ফলে লেখকের সামনে দৃশ্যশ্রব্য সমস্ত কিছুই সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত যতবেশি লেখা যাচ্ছে, তত বেশি অর্থ আসছে। একজন লেখকের বেঁচে থাকার জন্য দুটোরই প্রয়োজন। তাই লঘু সাহিত্য রচনায় লেখক পিছপা হবেন কেন? সবচেয়ে বড়কথা লেখক এবং প্রকাশক উভয়েই জীবিকার প্রয়োজনে সাহিত্যের অঙ্গনে এসেছেন। তাঁরা চান জীবন ও জীবিকার উন্নতি হোক সাহিত্যের নয়।

সাহিত্যের মূল ধারার কাজই হল চিন্তন এবং মননের। অথচ যে স্রোত এখন বইছে তাতে অনুশীলনকারী লেখক স্রোতের বাইরে চলে এসেছেন। এবং মূলধারাতে বজায় রেখেছেন। একজন অনুশীলনকারী লেখকই যে মূলধারার লেখক এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর উপস্থিতি যত প্রচ্ছন্নই থাকুকনা কেন, তিনিই মূলধারাকে ধরে রেখেছেন।

এতসবকিছুর পরেও প্রশ্ন জাগে পাঠক কি কি খায়? আমি এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নই। তবে হরিদাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি উত্তরও দিয়েছিলেন ছন্দ মিলিয়ে,

পাঠক কি খায় জান হরিদাস?
লতা পাতা আর কচিকচি ঘাস।

সুজান সন্‌ট্যাগ

চীন যাত্রার জন্য পরিকল্পনা

১.

আমি চীনে যাচ্ছি।

আমি হংকং আর চীনের মধ্যবর্তী শ্যাম চুন নদীর ওপরকার লুছ সেতু ধরে হাঁটব।

একবার চীনে পৌঁছতে পারলে আমি চীন এবং হংকংয়ের মধ্যবর্তী শ্যাম চুন নদীর ওপরকার লুছ সেতু ধরে হাঁটব।

পাঁচটি চলরাশি :

লুছ সেতু।
শ্যান চুন নদী
হংকং
চীন
চূড়োঅলা কাপড়ের টুপি

বাকী সম্ভাব্য পারমুটেশনগুলি মাথায় রাখা যাক।
আমি চীনে যাইনি।
আমি সবসময় চীনে যেতে চেয়েছি। সবসময়।

২.

এই যাত্রা কি কোন বাসনাকে পূর্ণ করতে পারবে?

প্রঃ [একটু থেমে] বাসনা বলতে চীনে যাওয়ার বাসনা বোঝাতে চাইছো কি?

উঃ যে কোন বাসনা।

হ্যাঁ।

কিন্তু এ'আমার গোটা জীবন!

ঘাবড়ে যেও না॥ "স্বীকারোক্তি কিছু নয়, জ্ঞানই সব।" এটা একটা উদ্ধৃতি কিন্তু কে এটা বলেছিল আমি তা বলব না।

সূত্র :

—একজন লেখক
—কোন জ্ঞানী ব্যক্তি
—জনৈক অষ্ট্রিয়াবাসী (বিঃ দ্রঃ এক ভিয়েনাবাসী ইহুদী)
—একজন বাস্তহারা
—জনৈক, ১৯৫১ তে যিনি আমেরিকায় মারা গেছিলেন।

স্বীকারোক্তিই আমি, জ্ঞান তো আর সবাই।

ধারণার প্রত্নবিদ্যা

আমাকে কি শব্দ নিয়ে একটু মজা করতে দেওয়া হবে?

৩.

এই যাত্রার ধারণাটি বেশ পুরোন।

কবে প্রথম এর জন্ম? যতদূর মনে আছে ঢের আগে।

—এই সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখা যে, আমি ভ্রূণাবস্থায় ছিলাম চীনে যদিও আমার জন্ম নিউইয়র্কে এবং বড়ো হই অন্যত্র (আমেরিকা)।

—ম. কে লেখা।

—টেলিফোন ?

চীনের সঙ্গে প্রাকজন্ম সম্পর্ক : কিছু খাবার হয়তো। কিন্তু মনে পড়ে না ম. কখনো বলেছে সে কখনো চাইনিজ রান্না পছন্দ করত।

—সে কি বলেনি জেনারেলের ব্যাংকোয়েটে সে একশো-বছর-পুরোন ডিমের গোটাটাই ন্যাপকিনে বমি করে ফেলে ছিল ?

যাইহোক, কোনকিছু রক্তমাংসের পর্দা চুঁইয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

মিরনালয় চীন, **তুরনিউট** চীন। ওয়েলেসলীর সুন্দর কোটিপতি সুং বোনরা এবং তাদের স্বামীর। দৃশ্যপট জেড, পাথর, কাঠ, বাঁশ, আর ভাজা কুত্তার।

মিশনারী, বিদেশী সামরিক পরামর্শদাতার দল। গোবি মরুভূমিতে পশুর লোম বিক্রেতার দল, আর তাদের মধ্যে আমার তরুণ বাবা।

চৈনিক ব্যাপার-স্যাপার আমার মনে পড়ে ছিল সর্বপ্রথম বসবারঘরে (দু'বছর-বয়স যখন আমার তখন, চলে আসি) : মোটাসোটা হাতির দাঁত আর গোলাপি-স্কটিকের তৈরি কুচকাওয়াজে ব্যস্ত হাতি, সোনার জলে কাজ করা কাঠের ফ্রেমে আটকানো ওগলা খড়ের তৈরি সরুমতন স্ক্রোল, কালো ক্যালিগ্রাফি একটা আঁটোসাঁটো গোলাপি সিল্কের বিরাট ল্যাম্পশেডের নিচে স্থাবর পেটুক বুদ্ধ, সাদা পোর্সিলেনের রোগা পরমকরুণাময় বুদ্ধদেব।

—চৈনিক শিল্প-ঐতিহাসিকরা পোর্সিলেন আর প্রোটোপোর্সিলেনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা সংগ্রহ করে।

স্মৃতিচিহ্নগুলো বয়ে আনে, ফেলে এগিয়ে যায় আরেকটি বসবার ঘরের দিকে। যে ঘর সত্যিকারের চীনা বাড়ির তা আমি কখনো দেখি নি। কোনরকম প্রতিনিধিত্বহীন, স্বচ্ছ বস্তু নিচয়। দৈত রুচিসহ (কিন্তু এটা

এখন জেনেছি আমি)। মাথা গুলিয়ে দেয় সবিনয় প্রার্থনাসমূহ। পাঁচটি ছোট্ট নলাকৃতি সবুজ জেড পাথর দিয়ে তৈরি জন্মদিনের উপহার একটা ব্রেশলেট, যার প্রত্যেকটার অপরিসর শেষাংশই সোনা-বাঁধানো, কখনো পরি নি আমি।

—জেড পাথরের রং :

সবুজ, সবরকমের বিশেষত পান্না সবুজ এবং
নীলাভ সবুজ
সাদা
ধূসর
হলদে
বাদামী
লালচে
অন্য রঙের

একটি নিশ্চিত ব্যাপার : চীন আমার মনে পড়া প্রথম মিথ্যাটিকে উসকে দেয়। ফার্স্ট গ্রেডে ঢুকেই আমি আমার সহপাঠীদের জানাই যে আমার জন্ম চীনে। মনে হয়েছিল ওরা এতে বেশ প্রভাবিত হলো।

জানতাম আমি চীনে জন্মাই নি।

আমার চীনে যাওয়ার চারটি কারণ :

বাস্তবিক
সাধারণ
ফলপ্রসূ
প্রধান

পৃথিবীর সবথেকে পুরনো দেশ : এর ভাষা শিখতে গেলে বছর কয়েক ধরে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করা দরকার॥ সায়েন্স ফিকশনের দেশ, যেখানে প্রত্যেকে এক স্বরে কথা বলে। মাও জে-দং-প্রভাবিত।

সে-স্বর কার, সে স্বর এমন একজনের যে চীনে যেতে চায়? এক শিশুর স্বর। ছ'বছরের কম বয়েসী।

চীনে যাওয়া কি চাঁদে যাওয়ার মত? ফিরে এসে জানাব তোমায়।

চীনে যাওয়া কি ফের জন্মানোর মতন?

চীনে আমি গর্ভধারণ করেছিলাম ভুলে যাও।

৪.

কেবল আমার বাবা মা-ই না, রিচার্ড আর প্যাট নিকসন পর্যন্ত আমার আগে চীনে গেছে। মার্কো পোলো, ম্যাটিও রিচ্চি, লুমিয়ের ব্রাদার্স (বা কম করে তাদের একজন অন্তত), তেইয়ের দ্য শারদা, পার্ল-বাক, পল ক্লদেল এবং নর্মাণ বেথুনের নাম তো বলছিই না। ঔরি স্নম ওখানেই জন্মায়। প্রত্যেকেই ফেরার স্বপ্ন দেখেছে।

—ম. কি বছর তিন আগে ক্যালিফর্নিয়া থেকে হাওয়াই চলে আসে চীনের কাছাকাছি যেতে পারবে বলে?

১৯৯৩-এ যে চিরকালের মতো ফিরে এসে ম. বলত, "চীনে চী বাচ্চারা কথা বলে না।" কিন্তু আমাকে তার বলা যে, চীনে, টেবিলে বসেই বমি করা হল খাবারের প্রশংসা করার সহজ রাস্তা, এর অর্থ এই নয় যে উগড়ে দেয়াটা চলতেই পারে।

বাড়ির বাইরে থাকাকালীন মনে হত আমি আমার মত করে চীনকে বানিয়ে নিতেই পারি। জানতাম মিথ্যে বলছি যখন স্কুলে গিয়ে বলি যে আমি ওখানে জন্মেছিলাম; কিন্তু কথা হলো, এত বড়ো আর বিশেষ রকম এক মিথ্যের একটা সামান্যতম অংশ হিসেবে আমারটা নেহাৎই ক্ষমাই। আরো বড় মিথ্যের খাতিরে বলা আমার মিথ্যেটা হয়ে আসে একরকম সত্যিই। আসল ব্যাপার হল আমার সহপাঠীদের বিশ্বাস করানো যে চীন বলে একটা জায়গা সত্যিই আছে।

স্কুলে আমি যে আধ-অনাথ এটা ঘোষণা করার আগে না পরে আমি প্রথমবার মিথ্যে কথা বলি?

—ওটা ঠিকই ছিল।

সবসময়ই ভেবে এসেছি: চীন ব্যাপারটা নেহাত ইয়ার্কি নয়।

—এখনো তাই।

যখন আমার বয়স দশ বছর পেছনের জমিতে আমি একটা গর্ত খুঁড়ি। গর্তটা ছ ফুট বাই ছ ফুট বাই ছ ফুট হলে তবে থেমেছিলাম। 'কি করতে চাও বলো দেখি?' বাড়ীর কাজের মহিলাটি জানতে চায়, চীন পর্যন্ত গোটা জায়গাটা খুঁড়ে ফেলবে নাকি?

উঁহু। আমি কেবল ভেতরে ঢুকে বসে থাকবার একটা জায়গা চাইছিলাম। আট ফুট লম্বা কাঠের তক্তা বিছিয়ে ছিলাম গর্তের উপর: মরুভূমির সূর্য ঝলসে দিচ্ছিল। যে বাড়ীটায় তখন আমরা থাকতাম শহরের উপকণ্ঠে একটা নোংরা রাস্তার উপর একখানা চার কামরার প্লাষ্টার করা বাংলো। দাঁতালো এবং স্কটিক হাতিগুলো নীলাম করা হচ্ছিলো।

—আমার প্রত্যাখ্যান

—আমার খোপ

—আমার পড়াশুনো

—আমার কবর

হ্যাঁ আমি চীন অব্দি গোটা পথটা খুড়তেই চেয়েছিলাম। এবং খুঁড়ে উঠতে চেয়েছিলাম অন্যদিকে, সে-আমায় ডিগবাজি খেয়ে বা হাতে ভর করে উঠতে হোক।

একদিন বাড়িঅলা জীপ চালিয়ে এল আর এসে ম. কে বলল গর্তটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বুঁজিয়ে ফেলতে হবে কেননা ওটা বিপজ্জনক। রাত্তিরবেলা যে-কেউ জমিটা পেরুতে যাবে এবং ওতে গিয়ে পড়তে পারে। তাকে দেখালাম কিভাবে, ওটা পুরোটা তক্তা, মোটা তক্তা পেতেই, ঢেকে রেখেছি, শুধু উত্তর দিকটায় ছোট্ট চৌকো ঢোকার জায়গাটা কাছে যেখান দিয়ে অতি কষ্টে আমি নিজেই একমাত্র নেমে বসতে পারি।

—যাই হোক রাত্তিরে কে ঐ জমি পেরুতে পাচ্ছে ? কোন খুদে নেকড়ে পথভোলা আদিবাসীও কোন টি. বি. বা হাঁপানি আছে কোন প্রতিবেশী ? কোন রাগী বাড়িঅলা ?

গর্তের ভেতর পুব দেয়ালে আমি একটা খোপ কাঠি, যেখানে একটা মোমবাতি রেখেছিলাম। মেঝেয় বসে থাকতাম নিজে। তক্তার ফাঁকাগুলো দিয়ে ময়লা ঝুরঝুর করে মুখে-চোখে এসে পড়ত। এতো অন্ধকার ছিল জায়গাটা যে কোনকিছু পড়া যেত না।

—লাফিয়ে নামার সময় কখনো ভয় হতো না যে আমি কোন সাপের ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছি বা কোন বুনো জানোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে গর্তের মেঝেয় বসে থাকতে পারে।

গর্তটা নিজেই বোঁজালাম। কাজের মেয়েটি সাহায্য করেছিল।

তিন মাস বাদে ফের ওটা খুঁড়লাম। এবার কাজটা ঢের সহজ হল কারণ মাটি বেশ ঝুরঝুরে ছিল। টম স্যয়াকে যে বেড়াটা সাদা রং করতে হয়েছিল সেটা মনে পড়ায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এমন পাঁচটা বাচ্চার মধ্যে তিনটিকে ধরতে পারলাম সাহায্য করার জন্যে। তাদের কথা দিলাম যখন আমি ওখানে নেই এমন সময় তারা ঐ গর্তে বসতে পারবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম। দক্ষিণ-পশ্চিম। আমার নিঃসঙ্গ শৈশব, ভারসাম্যহীন, রসকসহীন, গনগনে।

এই চৈনিক সমতাগুলো নিয়ে ভেবেছি :

পূর্ব	দক্ষিণ	কেন্দ্র	পশ্চিম	উত্তর
কাঠ	আগুন	মাটি	ধাতু	জল
নীলাভ-সবুজ	লাল	হলুদ	সাদা	কালো
বসন্ত	গ্রীষ্ম	শেষ গ্রীষ্ম/হেমন্তর	হেমন্ত	শীত
সবুজ	লাল	শুরু	সাদা	কালো
ড্রাগন	পাখি		বাঘ	কচ্ছপ
রাগ	আনন্দ	সহানুভূতি	দুঃখ	ভয়

আমি ঠিক কেন্দ্রে থাকতেই পছন্দ করেছি।

কেন্দ্র হল মাটি, হলুদ ; এ'থেকে গ্রীষ্মের শেষ থেকে হেমন্তের গোড়া পর্যন্ত এর আয়ু। কোন পাখি থাকে না তখন, কোন জানোয়ার পর্যন্ত না।

সহানুভূতি।

৫.

চীনা সরকার-কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমি চীনে এসেছি।

সবাই কেন চীনকে পছন্দ করে ? সকলে।

চীনা জিনিসগুলি :

চীনা খাবার-দাবার
চীনা লণ্ড্রি
চৈনিক অত্যাচার

চীন নিশ্চয়ই কোন বিদেশীর পক্ষে বিশাল ব্যাপার। কিন্তু বেশীরভাগ জায়গাই তো তা-ই।

এক মুহূর্তের জন্যে আমি 'বিপ্লব' (চীনা বিপ্লব) নিয়ে খোঁজ করছি না, কিন্তু ধৈর্য্যের অর্থটি বুঝতে চেষ্টা করছি।

এবং হিংস্রতা। এবং প্রতীচ্যের অন্তহীন আস্পাজগুলি। পুরস্কারপ্রাপ্ত অফিসাররা, যারা ১৮৬০-এ পিকিংয়ে অ্যাংলো-ফরাসী অধিগ্রহণে সাহায্য করে, সিভিলিয়ান এবং লগ্নীকারক-হিসাবে সমস্ত চীনে ফেরার সুখস্বপ্ন মাথায় নিয়ে ট্রাংক ভরে য়ুরোপ পাড়ি জমায় তারা।

—গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ 'দ্য ক্যাথেড্রাল অব এশিয়া' (ভিকতর য়ুগো) পুড়ে যায় এবং লুটপাঠ হয়।

—চীনা গর্জন।

চৈনিক ধৈর্য। কে কাকে গ্রাস করে নিল ?

আমার বাবা যখন প্রথম চীনে যান তখন তার বয়স ষোলো॥ ম. যান মনে হয়, চব্বিশ বছর বয়সে।

এখনো আমি যে কোন সিনেমায় যাতে একজন বাপ বাড়ি ফিরছে এক দীর্ঘ বেপোরোয়া অনুপস্থিতির পর দেখলে কেঁদে ফেলি সেই মুহূর্তে যখন সে তার শিশুকে আদর ক'রছে। বা শিশুদের।

প্রথম চৈনিক পদার্থটি আমি নিজের জন সংগ্রহ ১৯৬৮-এ মে মাসে হানয়ে। সবুজ-সাদা ক্যানভাসের শ্লিকার, যার রবারের শোলে উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা ছিল 'মেড ইন চায়না'।

১৯৬৮-র এপ্রিলে নম্ পেনের চতুর্দিকে রিকসো চেপে দৌড়ে-দৌড়ি করতে করতে আমি ১৯৩১-এ তিয়েনশিনে তোলা রিকসায় বসা বাবার ফটোর কথা ভাবতে থাকি। বেশ আনন্দিত, বাচ্ছা ছেলের মতন, লাজুক আর আনমনা দেখাচ্ছিল। সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আমার পরিবারের ইতিহাসের ভেতর যাত্রা। আমাকে বলা হয়েছিল যে, চৈনিকরা আনন্দ পায় যখন তারা জানতে পারে যে য়ুরোপ বা আমেরিকা থেকে আসা কোন আগন্তুকের যুদ্ধ-পূর্ব চীনের সঙ্গে কোনরকম যোগ রয়েছে। আপত্তি আমার বাবা-মা ছিলেন উল্টোদিকে। সহৃদয়, অভিজাত চীনা জবাব: কিন্তু যাবতীয় বিদেশীরা ঐ সময় চীনে থাকত তারা সবাই উল্টো দিকেই ছিল।

লাকস্তিশন হিউমেন ইংরেজিতে 'ম্যানস ফেট'। *ঠিকমত হল না।*

সবসময় আমি একশ বছরের পুরনো ডিম পছন্দ করে এসেছি। (এগুলো সম্ভবত পাতিহাসের, তুবছর, সময় নিতো সবুজ আর খানিকটা স্বচ্ছ-কালো চিজ হতে।

—সবসময় আমি চেয়েছি এগুলো একশ বছরের পুরনোই হোক!

কল্পনা করো কেমন ভিন্ন চেহারা নিতো।

নিউইয়র্ক এবং সানফ্রানসিস্কোর রেস্তোরাগুলোর আমি কখনো-সখনো ওর অংশ অর্ডার দিয়েছি। ওয়েটাররা তাদের নাকি-ইংরেজীতে জানতে চেয়েছে আমি

নিজে জানি তো কি কি চাইছি আমি। বলেছি, বেশ জানি। ওয়েটাররা চলে গেছে। যখন অর্ডার মত জিনিস এসেছে যাদের সঙ্গে খাচ্ছি তাদের বলেছি এগুলো কি ভাল খেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব স্লাইসগুলোই আমাকে নিজেকে গিলতে হয়েছে; প্রত্যেকে জানি মনে করেছে এটা বিশ্রি খেতে।

প্র. ডেভিড কি ঐ ডিম খেতে চেষ্টা করে নি? বারকয়েক?

উ. হ্যাঁ। আমায় খুশি করতে।

তীর্থযাত্রা।

আমি আমার জন্মস্থানে ফিরছি না, বরং চলেছি সেইখানে যেখানে পেটে এসেছিলাম।

যখন আমি চার বছরের, আমার বাবার পার্টনার, মি. চেন, আমায় শিখিয়েছিলো কিভাবে চপষ্টিক দিয়ে খেতে হয়। তিনি তাঁর প্রথম এবং অদ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে জানান আমাকে চীনাদের মত দেখতে।

চীনা খাবার

চীনা অত্যাচার

চীনা নম্রতা

ম. নজর রাখেন, সম্যতির সঙ্গে। ওরা সবাই নৌকোয় ফিরল একসঙ্গে।

চীন ছিল বস্তুসমূহ। সব অনুপস্থিতি। ম. র একটা রাই সোনা রঙের নরম সিল্কের পোশাক ছিল যা আসলে উনি বলেছিলেন, বিধবা সম্রাজ্ঞীর দরবারের জনৈক মহিলার জিনিস।

আর নিয়ম। আর নীরবতা।

গোটা সময় জুড়ে প্রত্যেকে চীনে কি করছিল? আমার বাবা আর মা ব্রিটিশদের আওতায় বসে ডেইজি আর গ্রেট গ্রাটসবি খেলতে ব্যস্ত ছিল, মাও-জে-দং দেশের ভেতর হাজার হাজার মাইল জুড়ে কুচকাওয়াজ, কুচকাওয়াজ, কুচকাওয়াজ, কুচকাওয়াজ, কুচকাওয়াজ, কুচকাওয়াজ করেছেন। শহরগুলোয় লাখলাখ রোগা কুলিরা আফিমে বুঁদ হয়ে থেকেছে, রিকসা টেনেছে, তু'পাশে নজর ছুটিয়েছে, বিদেশীদের হুকুম মেনেছে এবং মাছিদের দ্বারা উত্যক্ত হয়েছে।

অবছা 'সাদারুশী' অস্বাভাবিক ফর্সা যারা সামোভারের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, কল্পনা করতাম পাঁচ বছর বয়সে।

কল্পনা করেছি বকসারেরা তাদের ভারি চামড়ার গ্লাভস তুলে ধরছে কামানের গোলার প্রচণ্ড বেগে ছিটকে আসা সিসার টুকরোকে প্রতিহত করতে। তারা যে হেরে গেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

বিশ্বকোষে একখানা ছবি দেখছি যার শিরোনাম এরকম: অত্যাচারে জর্জরিত বকসারদের মৃতদেহ সহ একদল পশ্চিমীর স্মারক আলোক চিত্র। হংকং। ১৮৯৯। "সামনের সারিতে, মুণ্ডহীন একসার চীনামৃতদেহ যাদের মুণ্ডগুলি দূরেই গড়াগড়ি যাচ্ছে; সবসময় বোঝাও যাচ্ছে না কোন মুণ্ডটা কোন ধড়ের। সাতজন শ্বেতাঙ্গ এগুলির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। দুজনের মাথায় সরকারি টুপি; তৃতীয় জন টুপিটা হাতে ধরে আছে। পেছনে তেমন গভীর নয় জলে কিছু সাম্পান ভাসছে। বাঁদিকে কোন গাঁয়ের আরম্ভ হচ্ছে। পেছনে পাহাড়সারি অল্প বরফ জমেছে তাতে।

—লোকগুলি হাসছে

—সন্দেহ নেই যে পশ্চিমা বাহিনীর অষ্টম জন এ'ছবিটা তুলেছে।

সাংহাই জুড়ে কেবল ধূপধুনো, আর গানপাউডার আর গুয়ের গন্ধ। শতক ঘোরার মুখে আমেরিকা এক সেনেটর (মিসৌরি থেকে নির্বাচিত) 'ভগবানের দয়ায় আমরা সাংহাইকে উন্নত, উন্নত এবং উন্নত করে তুলব যতদিন না তা কনসাস সিটির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়।" ১৯০০-এর দশকের শেষ দিকে এক ষাঁড় জাপানী সৈনিকদের বেয়নেটের খোঁচায় পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে পড়ে আছে, তিয়েনশিনের পথে পড়ে গজরাচ্ছে।

মড়কে আক্রান্ত শহরের বাইরে, এখানে-ওখানে সবুজ পাহাড়ের বুকে সন্ন্যাসীরা নত হয়ে আছে। এক পরিপাটি ভৌগোলিক রম্যতা প্রত্যেক সন্ন্যাসীরা তার নিকটস্থ সঙ্গীর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই বৃদ্ধ কিন্তু সাদা দাড়িতে শোভিত হবার পক্ষে এতটা রোমশ নয়।

যুদ্ধবাজরা, জমিদাররা; চীনা রাজকর্মচারীরা, রক্ষিতারা। পুরনো চীনা হাত। উদ্ভত বাঘ।

শব্দগুলি যা আসলে ছবি। ছায়াব্যক্তি। এশিয়া জোড়া ঝড়ের মাতন।

৬.

আমি জ্ঞানে আগ্রহী। আমি দেয়ালে আগ্রহী। চীন দুটোর জন্যেই বিখ্যাত।

এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সালিস-(খণ্ড ৪, পারী ১৯৬৮, পৃ: ৩০৬)-এ চীনের সম্পর্কে লেখা "During the conversation, it is always loved by the succesor of short phrases when each one is fulfilled of the precedent, according to the chinese traditional method of reasoning.

জীবন উদ্ধৃতির। চীনে, উদ্ধৃতি-শিল্প পৌঁছেছে সবথেকে বিকশিত কুমিতে। সব কাজে পথ দেখায়।

চীনে একটি মেয়ে আছে, বয়েস উনত্রিশ বছর, যার ডান পায়ের পাতা পাতা তার বাঁ পায়ের উপর বসানো। তার নাম সুই ওয়েল শি। ১৯৭২-এর জানুয়ারীতে এক ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে তার ডান পা আর বাঁ পায়ের পাতা কাটা যায়। পিকিংয়ে তার ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ে বসবার অপারেশনটা হয়, পিপলস ডেইলি'র খবর অনুযায়ী, 'স্বাস্থ্য-বিষয়ে চেয়ারম্যান মাওয়ের প্রোলেতারিয় লাইনের তত্ত্বাবধানে, তবে উন্নত সার্জিক্যাল পদ্ধতিকেও এরজন্য ধন্যবাদ।"

—খবরের কাগজের লেখাটি ব্যাখ্যা করেছে কেন সার্জেনরা বাঁ পায়ের পাতা বাঁ পায়ে বসান নি: তার বাঁ পায়ের পাতার হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, ডান পাতাটি ছিল অক্ষত।

পাঠককে অন্যভাবে কোনকিছু মানতে বলা হচ্ছে না। এটা যেন সার্জিক্যাল মিথ্যাকল নয়।

আমি সুই ওয়েন শির একটা সাদা কাপড় ঢাকা টেবিলে শিরদাঁড়া খাড়া করে হাসিমুখে বসে থাকা ফোটো দেখছি। তার হাত দুটো জড়ো হয়ে আছে বাঁকানো বাঁ হাঁটুর ওপর।

ওর ডান পায়ের পাতা বিরাট বড়।

মাছিগুলো সব মরেছে, বিশ বছর আগের বিরাট মাছি নিধন প্রচারাভিযানের সময়। যেসব বুদ্ধিজীবিদের আত্মসমালোচনা করার পর, পাঠানো হয়েছিল গ্রামে চাষীদের কাছ থেকে পুনরায় শিক্ষিত হতে, তারা সাংহাই, আর পিকিং আর ক্যান্টনে ফিরছে।

জ্ঞান হয়েছে আরো সহজ, আরো সহজগম্য। আরো দিগন্তস্থিত। সন্ন্যাসীদের হাড় পাহাড়ের গুহাগুলোয় সাদা হয়ে এল আর শহরগুলো পরিষ্কার। লোকে তাদের সত্য বলতে উদগ্রীব, সবাই একসঙ্গে।

পা জোড়া দীর্ঘদিন পর মুক্ত হওয়ার জন্য মেয়েরা মিটিং ডাকছে পুরুষদের বিষয়ে 'তিক্ততা উগড়ে' দিতে। বাচ্চারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপকথা আওড়াচ্ছে। সৈনিকরা তাদের অফিসারদের নির্বাচন করছে আর বাতিল করছে। জাতিগতভাবে যারা সংখ্যালঘু তারা সীমিত রকম অনুমতি পেয়েছে লোককথায় উপজীব্য হতে। চৌ-এন-লাই নতুন ক্ষমতায় আসা শক্তির মত রোগা আর স্থঠাম রয়ে গেলেন কিন্তু মাও-জে-দং এখন ল্যাম্পশেডের নিচে মোটা বুদ্ধের মতো হচ্ছেন। প্রত্যেকে খুব শান্ত।

৭.

তিনটে জিনিস আমি গত বিশ বছর ধরে প্রতিজ্ঞা করে আসছি মরার আগে করে যাবো :

—মাটিরেহরণে চড়ব
—হার্পিমকর্ড বাজাতে শিখব
—চীনা ভাষা শিখব।

সম্ভবত ম্যাটারহর্ণে চড়ার পক্ষে এখনো সময় যায়নি। (যেমন মাও জে দং শিক্ষাপ্রদরকম বৃদ্ধ হয়েও, ইয়াংসি ধরে এগার মাইল সাঁতরেছেন) আমার ছ্যাঁদাঅলা ফুসফুস দুটো আজ আমার কম বয়েসের থেকে ঢের বেশি সফল।

রিচাল ম্যালোরি চিরকালের জন্যে বিরাট মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেল, যেটাকে দেখা গেল চূড়ার কাছে পৌঁছেছে। আমার বাবা, টিবি রুগী চীন থেকে ফেরেন নি।

কখনো সন্দেহ ছিল না কোনদিন চীনে যাব। এমনকি একজন আমেরিকানের পক্ষে যাওয়াটা কঠিন হয়ে গেল, অসম্ভব হয়ে গেল তখনো।

—এত নিঃসন্দিগ্ধ হয়েও আমার তিনটে পরিকল্পনার একটাকেও বাস্তব করতে চাইনি।

ডেভিড বাবার আংটি পরে। আংটিটা, কালো সিল্কের সুতো দিয়ে কোনে বাবার নামের আদ্যাক্ষর সেলাই করা সাদা সিল্কের স্কার্ফটা, আর ভেতরে ছোট সোনার অক্ষরে ওঁর নাম লেখা শুকরের চামড়ার ওয়ালেটটা বাবার জিনিসপত্রের এগুলোই রয়েছে আমার হেপাজতে। জানি না ওঁর হাতের লেখা কেমন ছিল ছিল, এমন কি সইটাও। আংটির চ্যাটালো সামনেটায়ও ওঁর নামের আদ্যাক্ষর আছে।

—অবাক কাণ্ড যে, ওটাও ডেভিডের আঙুলে ঠিকঠাক লেগে গেল।

আটটি চলরাশি :

রিকশা
আমার পুত্র
আমার বাবা
বাবার আংটি
চীন
মৃত্যু
আশাবাদ
নীল কাপড়ের জ্যাকেট

অনুলোকের সংখ্যা এখানে মনোমত : মহাকাব্য, দুর্ভাগ্যজনক। টনিক।

আমার কাছে কিছু ফটোও আছে, আর প্রতিটাই তোলা আমার জন্মের আগে। রিকশা, উটের পিঠে আর নৌকোর ওপর, নিষিদ্ধ শহরের পাঁচিলের সামনে। একা। তাঁর রক্ষিতার সঙ্গে। যার সঙ্গে, ওঁর দুই অংশীদার মিঃ চেন আর সাদা রুশীর সঙ্গে।

অদৃশ্য একজন বাবা থাকাটা বেশ মনের ওপর চাপ ফ্যালে।

প্রঃ ডেভিডেরও কি একজন অদৃশ্য বাবা নেই?
উঃ হ্যাঁ, তবে ডেভিডের বাবা মৃত বালক নয়।

বাবা তরুণ হচ্ছিলেন। (জানি না কোথায় ওঁকে কবর দেয়া হয়েছিল। ম. বলেছে সে ভুলে গেছে)।

একটা শেষ না হওয়া ব্যথা হয়ত অশেষ চীনা হাসিতে মিলিয়ে যেতে পারে, যেতেই পারে।

৮.

সবথেকে বিদেশী জায়গা।

চীন এমন এক জায়গা যেখানে আমি, অন্তত, যেতে পারি কারণ আমি যাব ঠিক করেছি বলেই।

আমার বাবা-মা ঠিক করেছিলেন চীনে আমার আসাটা ঠিক হবে না।

আমাকে সরকারের কাছ থেকে আমার আমন্ত্রণ পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হল।

—আরেক সরকার।

তখনকার জন্য, যখন আমি অপেক্ষা করছি, ওদের চীনে, পিগটেইল এবং চিয়াং কাইশেকের চীন ও গোনার পক্ষে অজস্র লোকের চীনদেশটি উপড়ে ফেলেছিল আশাবাদের চীন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চীন, গোনার পক্ষে অজস্র লোকের চীন, নীল কাপড়ের জ্যাকেট ও চুড়ো অলা টুপির চীনকে।

ধারণা, পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণা।

এই যাত্রা বিষয়ে কোন্ ধারণাই বা আগে ছিল আমার?

রাজনৈতিক বোঝাপাড়ার সন্ধানে কোন যাত্রা কি এটা?

—"সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংজ্ঞা বিষয়ে টীকা"?

হ্যাঁ কিন্তু আন্দাজের মধ্যে নিহিত, ভুল ধারণার ভেতর ব্যাপ্ত। যেহেতু আমি ভাষাটা বুঝি না। যখন তিনি মারা যান তখন বাবার যা বয়েস ছিল তার বছর ছয়েক বেশি বয়েসেও আমি ম্যাটারহর্নে চড়িনি বা হার্পসকর্ড বাজাতে শিখি নি বা চীনা ভাষা শিখি নি।

একটি যাত্রা যা ব্যক্তিগত ক্ষোভ কমাতে পারে?

তাই যদি হয় তবে, ক্ষোভটা কমতে পারে একটা আশাপ্রদ পথেই: কেননা আমি ক্ষোভটা কমুক চাইছি। মৃত্যুকে মোছা যায় না, বোঝাপড়ায় আসা যায় না তার সঙ্গে। মেলানো অসম্ভব নয়। কিন্তু কে কাকে গ্রাস করছে? "প্রত্যেক মানুষই মরবে, কিন্তু মৃত্যু তার গুরুত্বের দিক থেকে নানারকম হতে পারে। প্রাচীন চীনা লেখক সুজমা চিয়েন বলেছেন, 'যদিও মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনে এক ভাবে আসে, তবু কোথাও তা তাই পাহাড়ের থেকেও ভারী হতে পারে কোথাও পালকের মত হালকা।"

—এটা 'কোটেশন ফ্রম চেয়ারম্যান মাও-সে-দুং'-এ প্রদত্ত ছোট্ট উদ্ধৃতির পুরোটা না, কিন্তু এর এইটুকুও এখন দরকার আমার।

—লক্ষ্য করুন মাও-ও সে-তুং থেকে সংক্ষিপ্তায়িত উদ্ধৃতির মধ্যে আরেকটি উদ্ধৃতি রয়েছে।

—উদ্ধৃতিটির বাদ দেয়া শেষ বাক্যটি পরিষ্কার করে দেয় যে, ভারী মৃত্যু কাম্য, হালকাটি না।

তিনি মারা যান বহুদূরে। আমার বাবার মৃত্যুকে পরিদর্শন করা মারফৎ আমি তাকে ভারী করে তুলেছি। আমি ওঁকে আমারই ভেতর কবর দেব।

আমি আমার থেকে পুরো আলাদা হয়ে একটা জায়গা দেখতে যাব আগে থেকে ঠিক করে রাখা অপ্রয়োজনীয় যে তা ভবিষ্যত না অতীত।

চীনাদের যা আলাদা করে রাখে তা হল তারা একই সঙ্গে অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বাস করে।

যে ব্যক্তিকে সত্যিই চোখে পড়ার মত মনে হয় তারা অন্য কালে বাস করার ভাব বহন করে। হয় অতীতের কোন কালসীমায় বা কেবল ভবিষ্যতে)। কোন অসাধারণ কেউই পুরো সমসাময়িক হিসাবে আসে না। যে লোকেরা সমসাময়িক তারা প্রতিভাতই হয় না:

তারা অদৃশ্য।

নৈতিকতাবাদ হলো অতীতের ব্যাপার, নৈতিকতাবাদ ভবিষ্যতের দুনিয়াকে শাসন করে। আমরা থতমত খাই। সচেতন, ব্যাঙ্গাত্মক, স্বপ্নভঙ্গ। এই বর্তমান যে কি কঠিন একটা সেতু হয়ে উঠেছে! কতো যে অজস্র, প্রচুর ভ্রমণ যে আমাদের করতে হয় যাতে না ফাঁকা হয়ে পড়ি ও অদৃশ্য না হয়ে যাই।

৯.

'দ্য গ্রেট গ্যাটসবি' থেকে, পৃঃ ২ : "যখন গত হেমন্তে আমি প্রাচ্য থেকে ফিরলাম আমি টের পেলাম যে আমি চাইছি জগতটা একই রকম হোক এবং একই ধরণের নৈতিক মনোযোগ থাকুক সর্বদাই ; আমি চাইছিলাম মানব হৃদয়ের ক্ষেত্রে কোন সুযোগেই আর কোন উচ্ছৃঙ্খল অভিযান না হোক।"

—আরেকবার 'প্রাচ্য', কিন্তু কিছুইযায়-আসে না। উদ্ধৃতিটি মিলে গেছে।

—ফিউজেরাল্ড নিউইয়র্ক বুঝিয়েছেন, চীন না।

—("উদ্ধৃতির আধুনিক ব্যবহার আবিষ্কার" নিয়ে আরো বলা দরকার, হানা আরেন্ড্ট ওয়াল্টার বেঞ্জামিন-বিষয়ে উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁর প্রবন্ধ 'ওয়াল্টার বেঞ্জামিন'-এ বলেছেন।

—তথ্য :

একজন লেখক
বুদ্ধিমান কেউ
জনৈক জর্মন [বিশেষত, বার্লীনবাসী এক ইহুদী]
জনৈক বাস্তহারা
যে মারা যায় ফরাসী-স্পেনীয় সীমান্তে
১৯৪০-এ

—বেঞ্জামিনের পাশে যোগ করুন মাও-ৎ সে-তুং ও গোদারকে।)

"যখন গত হেমন্তে আমি প্রাচ্য থেকে ফিরলাম আমি টের পেলাম যে আমি চাইছি জগৎটা…" জগৎটা কেন নৈতিকতায় অতন্দ্র হবে না? বেচারী, আহত জগৎ।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথমাংশটি অজানা এক অস্থির ইহুদী বাস্তহারা সাধু যে মারা গেছিল আমেরিকায় : "মানুষ, বলতে কি, আমাদের সমস্যার একটা সমস্যা ; ব্যক্তির সমস্যাগুলো মুছে যাচ্ছে এবং এমনকি নিষিদ্ধ-ও, নৈতিক দিক থেকে নিষিদ্ধ।"

ব্যাপারটা এ'নয় যে চীনে যাবার মধ্যে দিয়ে আমি সাধারনের মধ্যে মিশে যাব বলে ভীত। সত্য হয় সাধারণ।

আমাকে কারখানা, বিদ্যালয়, যৌথ খামার, হাসপাতাল, যাদুঘর, বাঁধ এসব দেখতে নিয়ে যাওয়া হবে। ভোজ এবং ব্যালের ব্যবস্থা হবে। আমি একলা হতে পারব না। কখনো-সখনো হাসব (যদিও আমি চীনা ভাষা বুঝি না)।

মালিকহীন উর্দ্ধৃতির দ্বিতীয়াংশ : "ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যাবলী হয়ে পড়েছে দেবতাদের কাছে হাস্যকর জিনিস এবং ওঁরা ওঁদের দয়াহীনতার ক্ষেত্রে সঠিক।"

"ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন "বলেছেন চেয়ারম্যান মাও। নীতি অনুসারকদের গুরু।

একদা চীন বলতে বোঝাত চূড়ান্ত সূক্ষ্মতা : কাঁচের জিনিসপত্র, হিংস্রতা, জ্যোতিষবিদ্যা, রীতিনিয়ম, খাদ্য, বিকৃতি, দৃশ্যাবলী চিত্রণ, লিখিত চিহ্নের সঙ্গে ভাবনার সম্পর্ক সর্বত্র। এখন চীন মানে চূড়ান্ত সাধারণীকরণ।

যা আমাকে আমার চীন যাত্রার আগে যাত্রা স্থগিদ রাখায় নি তা হল ভালত্ব-বিষয়ে এ্যাতোসব কথাবার্তা। প্রত্যেকের মধ্যে খুব ভালো হওয়া বিষয়ে যা আমি দেখেছি সেই উদ্বেগ আমার ছিল না।

—যেন ভালোত্ব সঙ্গে করে বয়ে আনে এক জাতের উদ্যমও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র হারাবার ব্যাপারটা ;

—পুরুষের মধ্যে, পুরুষত্বহানি।

'ভালো লোকেরা শেষে মরে।' আমেরিকানরা বলে থাকে।

"একটু ভাল কাজ করা কারো পক্ষে খুব কঠিন নয়। যেটা শক্ত তা হল একজীবনে সব ভাল করা এবং কখনো খারাপ না করা…" কোটেশন ফ্রম চেয়ারম্যান মাও-সে তুং, ব্যানটাম পেপারব্যাক সংস্করণ, পৃঃ ১৪১)।

অত্যাচারিত কুলি ও বেশ্যাদের দিয়ে ভরা এক পৃথিবী। হিংস্র জমিদারে ভরা। হাত ভাঁজ করে রাখা, তাদের আলখাল্লার ঢোলা হাতায় লুকিয়ে রাখা

লম্বা নখঅলা উদ্ধত সব চীনা শাসকে ভরা। সকলেই বদলে যাচ্ছে, শান্তভাবে ঐশ্বরিক সব গার্ল ও বয় স্কাউটস, যেন চীনের আকাশে লাল তারা।

কেন ভাল হতে না চাওয়া?

অথচ ভাল হতে হলে সাধারণ হতেই হবে। সাধারণ যেন উৎসের পথে ফিরে আসা। সাধারণতর, যেন এক বিরাট বিস্মরণের গভীরে।

১০.

একবার, চীন ছেড়ে আমেরিকায় তাদের সন্তান (বা সন্তানদের) দেখবার জন্যে আমার বাবা আর ম. ট্রেন ধরেন। ট্রানস-সাইবেরিয়ান রেলপথে, দশদিন ডাইনিংকার ছাড়াই ভ্রমণ করতে করতে, ওঁরা কামরাতেই একটি ষ্টোভে রান্না করে নেন। যেহেতু বুক ভরে একটিবারের মত সিগারেটের ধোঁয়া টানলেই বাবার পক্ষে হাঁপের টান ওঠা যথেষ্ট, ম. যে সিগারেট খেত, সম্ভবত করিডরেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয়।

—আমি এটা কল্পনা করছি। ম. কখনো আমায় বলে নি এটা কারণ আমায় পরবর্তী ঘটনাটি জানায়।

স্তালিনের রাশিয়া অতিক্রমের পর, যখন ট্রেন থেমেছে বায়ালিষ্টকে ম. নেমে যেতে চায়, যেখানে তার মা যিনি, ম যখন চোদ্দ বছরের লস- এঞ্জেলসে মারা যান, জন্মেছিলেন, কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে বিদেশীদের জন্যে নির্দিষ্ট কামরাগুলোর দরজা সিল করা ছিল।

—ট্রেনটি ষ্টেশনে কয়েক ঘণ্টা থামে।

—বৃদ্ধা মহিলারা বরফে আচ্ছন্ন জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে তাদেরকে কমলাবেবু আর ঈষদুষ্ণ রাশি-বীয়ার বিক্রি করতে চাইছিলেন।

—ম কাঁদছিল।

—কেবল একটিবারের জন্যে যে চাইছিল তার মায়ের কবেকার জন্মস্থানের মাটি পায়ের নিচে অনুভব করতে।

—তাকে অনুমতি দেয়া হয় নি। (তাকে সাবধান করা হয় এই বলে যে, যদি একবার সে এক মিনিটের জন্যেও ট্রেনের বাইরে পা দিতে চায় তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

—সে কেঁদেছিল।

—আমাকে বলে নি যে সে কাঁদছিল, কিন্তু জানি সে কেঁদেছিল। আমিতাকে দেখেছি যে।

সহানুভূতি। হারানোর বোধমালা। মহিলারা তিক্ততার কথা বলতে জড়ো হয়। আমি তিক্ত হয়েছি।

কেন ভাল হতে না চাওয়া? হৃদয়, পরিবর্তন (হৃদয় সবথেকে বাইরের স্থান।)

যদি আমি ম. কে ক্ষমাকরি আমি নিজেকে মুক্তি দেব। সে আজো, বছর কয়েক বাদেও, তার মাকে মারা যাবার জন্যে ক্ষন্তে ক্ষমা করে নি। আমি আমার বাবাকে ক্ষমা করব। মারা যাবার জন্যে।

—ডেভিড কি করবে তার বাবাকে? (মারা যাবার জন্যে নয়।) তার ঠিক করার জন্যেই ছাড়া থাক।

"ব্যক্তির সমস্যা দূরীভূত হচ্ছে..."

কোথাও, আমার মধ্যেই কোন জায়গায় আমি নিস্পৃহ। আমি সর্বদাই নিস্পৃহ ছিলাম (আংশিক), সর্বদা।

—প্রাচ্য নিস্পৃহতা?

—অহং?

—ব্যথার ভয়?

ব্যাথার প্রতি শ্রদ্ধায়, আমি শিল্পী হয়েছি।

১৯৩৯-র গোড়ায় চীন থেকে আমেরিকার ফেরার পর তার মাস কয়েক লেগেছিল আমাকে জানাতে যে আমার বাবা ফিরে আসবে না। তখন প্রায় আমি ফাষ্ট গ্রেডে উঠি উঠি করছি যেখানে আমার ক্লাসের বন্ধুরা মনে করত আমি জন্মেছি চীনে। যখন সে আমায় বসবার ঘরে ডাকল তখনই জানতাম যে, যে এটা এক শান্ত ঘটনা।

—যেদিকেই ফিরেছি, সুসজ্জিত সোফায় আড়ষ্টভাবে যেদিকেই ঘুরেছি

সেদিকেই আমাকে হতচকিত করে দেবার জন্যে বুদ্ধের মূর্তি রাখা।

—কম কথায় সে সব জানায়।

—বেশি কাঁদি নি। আমি কল্পনাই করতে শুরু করেছিলাম কি ভাবে এই নতুন খবরটা বন্ধুদের বলব।

—আমাকে বাইরে খেলতে পাঠানো হল।

—সত্যিই বিশ্বাস করিনি বাবা মারা গেছেন।

প্রিয় ম., আমি ফোন করতে পারি না। আমার বয়স ছয়। আমার শোক তোমার নিস্পৃহতার উষ্ণ ভূমিতে বরফের তুলোর মতন ঝরে পড়ছে। তুমি তোমার নিজের ব্যথারই ঘ্রাণ নিচ্ছ।

শোক গভীর হয়ে উঠল। আমার ফুসফুস দুটি দোলায়মান আমার ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে উঠলো। আমরা মরুভূমিতে গেলাম।

ককতোর Le Potomak (১৯১৯ সং, পৃ. ৬৬) থেকে: "Ie etait, dans la vill dc tien sin. un papillon."

যাই হোক, বাবা ভিয়েনশিনে পড়ে রইলেন। চীনে থাকাকালীন গর্ভে আসাটা হয়ে উঠল আরো গুরুত্বপূর্ণ।

মনে হচ্ছে ওখানে যাওয়াটা এখন আরো ঢের গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস আজ আমার ব্যক্তিগত, নিজস্ব যুক্তি সমূহকে মিলিয়ে দিল। ঝলসে দিল, এলোমেলো করে দিল, ধ্বংস করল। নেপোলিয়ন থেকে অদ্যাবধি সব বিশ্ব-ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের শ্রমকে ধন্যবাদ।

কোন অবসন্নতা নয়। যন্ত্রণা নিশ্চিত নয়। মাও-য়ের উজ্জ্বল বিজ্ঞানকে ব্যবহার করো: "এক হও, সচেতন থাকো, একাগ্র হও, এবং জীবনময় হও।" (ঐ সং, পৃ. ৮১)

'সচেতন থাকো' এর মানে কি? প্রত্যেক ব্যক্তিই কি ভেতরে ভেতরে সচেতনভাবে আলস্যকে এড়ায়?

—সবই খুব ভাল, বড়ো বেশি সত্যকে আত্মস্থ করা ঝুঁকিটা বাদে।

—'এক হও'-এর ক্ষতির কথা ভাবো।

সচেতন থাকার মাত্রাটা যে মাত্রায় একজন কুঁড়ে নয় তাতে ভারসাম্য আনে, ভারসাম্য আনে অভ্যাসকে এড়ানোতেও। সতর্ক হও।

সত্য হল সাধারণ, ভারী সাধারণ। কেন্দ্রীভূত। কিন্তু লোকে সত্যের পাশাপাশি বাকী অভ্যাসগুলোকেও কামনা করে। দর্শন ও সাহিত্যে এর সুবিধাবাদী বিকৃতি। উদাহরণতঃ।

আমি আমার কামনাকে শ্রদ্ধা করি এবং এ'ব্যাপারে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি।

সাহিত্য হল জ্ঞানের দিক থেকে একমাত্র অস্থিরতা।" (অনামা অষ্ট্রিয় ইহুদীর তৃতীয় ও শেষ উদ্ধৃতি, যিনি এক বাস্তহারা হিসেবে আমেরিকায় মারা যান।)

ভিসা হাতে এসে যাবার পর আমি চীন-যাত্রার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ছি। সাহিত্যের সঙ্গে সংঘর্ষে কি আমাকে থামতে হবে?

ইয়েনান বক্তৃতা ও অন্যত্র মাও-সে তুঙের মতে যদি সাহিত্য জনগণের হয় তাহলে এ'এক অস্তিত্বহীন সংঘর্ষ।

কিন্তু আমরা কথার চাকর। (সাহিত্য আমাদের জানায় কথা কি আরও সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা উদ্ধৃতি-শাসিত। কেবল চীনে নয় সর্বত্রই একই ভাবে। অতীতের স্থানান্তরকরণের জন্যে এত! বাক্যদের এলোমেলো কর, স্মৃতিকে ভাঙো।

—যখন আমার স্মৃতি স্লোগান হয়ে ওঠে তখন আর তাদের দরকার নেই। তাদের বিশ্বাস করা নয়।

—আরেক মিথ্যা?

—একটি অমনোযোগী সত্য?

মৃত্যু মরে না আর সাহিত্যের সমস্যাগুলি মুছে যায় না……

১২.

চীন ও হুকংয়ের মধ্যবর্তী স্যামচুন নদীর ওপর লুছ সেতু দিয়ে হাঁটার পর ক্যান্টনের দিকে একটা ট্রেন ধরব।

তারপর, আমি কমিটির হাতের মধ্যে। আমারটা আমন্ত্রেণকর্তাদের মুঠোয়। আমার মহান আমলাতান্ত্রিক ভার্জিল। ওরা আমার ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করছে। ওরা জানে আমি কি দেখি ওরা চায়, আমার পক্ষে কি দেখতে হবে ওরা চায়; এবং জানে আমি কি দেখি ওরা চায়, আমার পক্ষে কি দেখতে হবে ওরা চায়; এবং আমি ওদের সঙ্গে তর্কে যাব না। কিন্তু যখন ডাকা হবে বাড়তি মতামতের জন্যে ওদের আমি যা বলব তা হচ্ছে: আরো উত্তরদিকেই ভাল। আমি আরো কাছাকাছি যেতে পারব।

আমি ঠাণ্ডাকে ঘেন্না করি। আমার মরুভূমিতে কাটানো শৈশব আমার করে রেখে গেছে ট্রপিক অঞ্চল ও মরুভূমির গরমের অসম্ভব প্রেমিক; কিন্তু এ'যাত্রায় আমি যত প্রয়োজন ততটা ঠাণ্ডাকেই সহ্য করতে চাইছি।

—চীনে শীতল মরুভূমি আছে, গোবি মরুভূমির মত।

পৌরাণিক অভিযান।

অবিচার ও দয়াবোধ খুব কাছে আসার আগে, এবং উজ্জ্বল হবার আগে পৌরাণিক অভিযানগুলি ইতিহাসের বাইরে থাকত। নরক, যেমন মৃতদের ভূমি।

এখন এ'ধরণের অভিযানগুলি পুরো ইতিহাস-দ্বারা আচ্ছাদিত। সত্যিকারের মানুষদের ইতিহাস-দ্বারা অধিকৃত ভূমিতে পৌরাণিক অভিযান, এবং কারো ব্যক্তিগত ইতিহাস-দ্বারা অধিকৃত ভূমিতেও।

এল হল, অবশ্যম্ভাবীভাবেই, সাহিত্য। এ'ষা কিনা জ্ঞান তার থেকেও বেশি।

সংগ্রহ হিসাবে ভ্রমণ। আত্মার ঔপনিবেশিকতাবাদ, যে কোন আত্মা, যদিও যথেষ্ট ভাল উদ্দেশ্যবাহী।

—যদিও নির্মল, যদিও ভালো হবার দিকে ঝুঁকে পড়া।

সাহিত্য ও জ্ঞানের সীমারেখায় আত্মার বৃন্দবাদন (অর্কেষ্ট্রা) ভেঙ্গে পড়ে এক উচ্চগ্রাহী নিনাদে। ভ্রমণকারী থতমত খায়, কেঁপে ওঠে। তোতলাতে থাকে।

উদ্বিগ্ন করো না। কিন্তু যাত্রা সচল রাখতে গিয়ে, ঔপনিবেশিক বা আদিবাসী কেউই, কৌশল বজায় রাখতে পারে না। অজানা রহস্য উদ্ধারকারী হিসাবে ভ্রমণ করো। নির্ভার ভ্রমণ করো। আমি একটা ছোট সুটকেস নিচ্ছি, এবং ক্যামেরা বা টাইপরাইটার বা টেপ রেকর্ডার কোনটাই না। আশা করছি কোন চীনাবস্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসার আবেগ ঠেকাবার, তা সে সুন্দর কিছু, বা স্মৃতিচিহ্ন যা-ই হোক, যতোই হোক না কেন। যখন আমার মাথার ভেতই এতকিছু রয়েছে।

চীনের দিকে পা বাড়াবার জন্যে আমি যে কি উদগ্র হয়ে পড়েছি; যদিও এমনকি যাত্রার আগে, আমার একটা অংশ রীতিমত দীর্ঘ অভিযানে বেরিয়েই গেছে যা আমাকে এনে রেখেছে এর সীমানায়, দেশটি ভ্রমণ করিয়ে এবং দূরে সরিয়ে এনেছে ফের।

চীন এবং হংকংয়ের মধ্যবর্তী শ্যামচুন নদীর ওপর ছড়িয়ে থাকা লুছ সেতু ধরে হাঁটার পর আমি হনুলুলুর প্লেনে উঠব।

—যেখানে কখনো যাই নি।

—দিনকয়েকের জন্যে বিশ্রাম। তিন বছর বাদে আমি তিতিবিরক্ত; অলিখিত অক্ষরের অস্তিত্বহীন সাহিত্য এবং আমার ও ম.-'র মধ্যবর্তী না-করা টেলিফোনগুলি নিয়ে।

যার পর ফের আরেকটা প্লেন ধরব। যেখানে গিয়ে আমি একা হতে পারব: অন্তত, যুথবদ্ধতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারব। এবং বাঁচতে পারব এমন কি বস্তুদের ক্রন্দন থেকেও, ব্যক্তি-হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য আত্মকরুণার দ্বারা সম্প্রদান-কৃত—তা যে স্বস্তি বা নিস্পৃহতা যার মধ্যেই মিশে থাকুক না কেন—হিসাবে।

১৩.

আমি শ্যাম চুন নদী পার হব দু'দিক দিয়েই।
আর তারপর? কেউ বিস্মিত হল না। তারপর এল সাহিত্য।

—জানার অস্থিরতা
—আত্ম-অধিকার
—আত্ম-অধিকারের ক্ষেত্রে অস্থিরতা

আমি আনন্দের সঙ্গে চুপ করে থাকতে রাজী হতাম কিন্তু তখন, হায়, কি-ই জানব আমি। সাহিত্যকে অস্বীকার করতে, আমাকে নিশ্চিত হতে হবে সত্যিই যে আমি জানতে পারি। এক নিশ্চিততা দুরন্তভাবে প্রমাণ করতে পারত আমার অজ্ঞানতাকে।

তাহলে সাহিত্য। আগে ও পরে সাহিত্য, যদি দরকার লাগে। যা আমাকে এই স্থিরনিশ্চিত যাত্রার জন্য জরুরী অবসাদ ও কৌশলের দাবি থেকে মুক্তি দেবে না। অনেকগুলি বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতা করার ভয়ে আমি ভীত।

একমাত্র উপায়: জানা ও না-জানা দুই। সাহিত্য ও না-সাহিত্য, সেই একক মৌখিক ভঙ্গি ব্যবহার করা।

গত শতকের তথাকথিত রোম্যান্টিকদের ভেতর কোন যাত্রা সর্বদা রূপ পেত শেষাবধি কোন বইলেখায়। কেউ বেড়াতে যেত রোমে, এথেন্স, জেরুজালেমে —এবং তাবাদে—এ নিয়ে লিখতে।

হয়ত আমি চীনের পথে আমার ভ্রমণ-বিষয়ে বইটা লিখে ফেলব আমার যাবার আগেই।

ভাষান্তর: সঙ্গীতা সরকার

শ্যামলতরু মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণের অনিবার্য দিকসমূহ

নিহত হওয়ার আগেই সে শুকিয়ে গ্যালো। পায়ের ছাপ বলে যা পরিচিত হতে চাইছে। একটা ভ্রমণে কি অনেক পায়ের ছাপ পড়ে? আচ্ছা, একটা পায়ের ছাপকে আরেকটা পায়ের ছাপ দিয়ে তো কিছু একটা গড়া যায়। অতীতে মানচিত্র। বা বর্তমানে চিতার নিঃসঙ্গ পদচারণা।...ইদানিং আমি বাড়ীতে রবারের চটি পরে হাঁটছি। শীতের ঠাণ্ডা, না মেঝের ঠাণ্ডা এই কোলাহলে দাঁড়াতে টের পাই পদ-চিহ্ন তাও আমার শীতকালিন বেশ ভাবাচ্ছে। যেমন ইদানীং সমুদ্র পরিচয় নামে একটি সহজ গ্রন্থ ভাবাচ্ছে। লেখকের ভূমিকাটিও বেশ ভাবাচ্ছে। ১ম যেদিন সাইকেল-রিক্সা করে সমুদ্র আবিষ্কার করেছিলাম মনে হয়েছিলো, ক্লীনিক শ্যাম্পুর জল। ঘরে ফিরেই এই আধুনিক উপমায় বড়ো আহত হয়েছি। অর্থাৎ তা এমন ভাবেই ছাপ ফেলেছে। হ্যাঁ ছাপ শব্দটাই তুলতে হোলো দাগ নয়। দাগ শীর্ষক অসামান্য কবিতা অঁরি মিশো জানে আর জানে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ নয়। (হিউম-টিউম উচ্চারণ করলে ট্রিটিজের ৩ খণ্ডের পাতা ওল্টাতে হবে।)

□

ডানার ভেতরের রঙ না জানলেও আজ আমার চলে, বুঝি সূর্য আর ওভাবে নেই। তবু আমি আমার নির্জনতা বইপড়া আলোর অভাবের মধ্যেই জেগে ওঠে। হয়তো এটাও ঠিক গণতন্ত্র শব্দটা নিয়ে দূরে আলোড়ন চলছে। মাঝে মাঝে এটাও ঠিক দুটো বাড়ীর স্বাভাবিক চিত্র তুলে ধরতে বুঝেছি; তখন কৌশল বলে একটা বিজ্ঞান আছে কি ব্যক্তিগত আর কি সামাজিক এটাই এখন পর্যন্ত একটা অবস্থা। বাঁশের মাথায় বসে যে কাকটা দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ; সে কি আমাকে ওঠাতে চায় যদি চায় কেন চায় আজ অন্যান্য ঘটনার মতো পরিস্কার বুঝি। এটাও ঠিক এখানে অনেক সাদাকাক ওড়াওড়ি করে। এক কবির প্রশ্নে আর এক গদ্যলেখক বলে ওঠে ঃ বক ধার্মিক

এই সমস্ত কথাবার্তা একটা কাকের ডানার রঙ দেখে। অথবা বলা যায় একটা কাকের ধর্ম নামক ঐতিহাসিক অবস্থান বুঝতে পেরে।

তুমি খুব নিরীহ প্রকৃতির।

কে নিরীহ আমি না প্রকৃতি, জানি, এখন প্রকৃতি হচ্ছে টেষ্ট অব ডায়েলিকটিস।

□

মানুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বলে জ্ঞানত তার কি কোনো কাজে আসে? আসে না, ফলে আমি মনে করতে শুরু করি কথা গুলো আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আমি হিংসার এক প্রতিমূর্তি। গতরাত্রে আমার স্ত্রী আমাকে বলছিলো আমার নাকি একটু স্বভাব খারাপ অথচ আমি চরিত্র হীন নয়। ব্যাখ্যা করতে বললাম। ব্যাখ্যা করতে করতে এটা পরিস্কার করে ছাড়লো দি এণ্ড অব হিস্ট্রি গ্রন্থের সারকথা।

এবার স্থাথা যাক। ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা কিবলছেন The end of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the willingness to risk one's life for a purely abstracet goal, the worldwide ideological struggle that called forth daring, courage, imagintion, and idealism, will be replaced by econo-

mic calculation, the endless solving of technical problems, enviourmental concerns, and tne satisfaction of sophisticated consumer demands. In the post historical period there will be neither art nor philosophy, just the perpetual caretaknig of the museum of human history? (পাঠক ক্ষমা করুন ইংরিজী উদ্ধৃতির জন্য)

উজ্জয়িনী স্থাথো স্থাথো হাঁসটার মুখদিয়ে কেমন চা নির্গত হচ্ছে?

এর আগে কখনো স্থাথোনি? সানগ্লাস ভেঙে ভেঙে পড়ছে পড়ে রাত্রি বেলায়? ফুলদানী চুরি করে নিয়ে যায় ঐতিহাসিক।

আচ্ছা এটা তো হতেই পারে। সাদা টী-পট কেনাটা ভুল হয়েছিলো। ভুল হয়েছিলে একটা ভেজানো দরজায় ফাঁক দিয়ে আলোটা ঠিকরে পড়ছে তা অবলোকনে। বড়ো কথা হচ্ছে; দুর্ভিক্ষের সময় তাকে ফেলে তার বাবা-মায়ের এই যে মহাগ্রস্থান, ডকিউমেণ্ট না হলে আমাদের চলে না।

ইচ্ছে করে কখনো কোনো কিছু ভেঙেছো এই যে ধূমায়িত চায়ের কাপটা ধরে আছো বাঁ হাতের আঙুলে, তুলে নিয়ে ছেড়ে দিলে। না হোক এটা শীতকাল।

হঠাৎ জানলার দিকে কেন যে সে তাকায় বুঝতে পারেনা আতঙ্কে না অন্যকিছু সে যেন কোনো কিছু গোপন করতে চাইছে।

বহুদিন পর মনি-বন্ধনীর উপর তার কাটা দাগটাকে দেখে বেশ একটা কষ্ট হয়।

হৃদপিণ্ডটি খুঁজে, তাকে চুম্বন করতে হয়। কখনো এই বাংলাশব্দটিকে লক্ষ্য করেছেন কি? আমি যেমন লক্ষ্য করিনি কিভাবে একটি ২৫ পাওয়ারের বাল্ব বিকেল তৈরী করে ফ্যালে। সুতীর মশারীর বাইয়ে একটি চেয়ারে সে বসেছিলো। আমরা একে অন্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম। একটা সময় চোখটা নামিয়ে নিয়ে ছিলাম। এবার একটি ঘড়ির দিকে তাকাই। ঘড়িটার নাম VEGA, অর্থাৎ এক একটা তাকানো এক একটা কনসেপ্টের জন্ম স্থায়। কনসেপ্টের কাঙাল কিনা; আমি জানি না; জাক লাঁকা জানে, তবে বুঝতে পারছি কিছুক্ষণ আগে যে বালিশ লক্ষ্য করছিলাম তার দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তা চলতে থাকে। ঘুরে গিয়েই চলতে থাকে, কখনো

সেইজন্য ওটাকে বুকে জড়িয়ে নিই। তবে এটা বুঝতে পেরেছি মাথার নীচে রাখতে ভালো লাগে না। বালিশটা ঠিক কোন খানে রাখা যায় বুঝি না সঠিক। তা এভাবেই মনস্তত্ত্ব ক্রিয়া করতে থাকে। যেমন ইদানিং যে সাদা ফুলদানীটা লক্ষ্য করি কখনো তা মাছ কখনো শঙ্খ কখনো বা ঝোঁপ থেকে উড়ে পালাতে চায় এ ধরনের সাদা বক মনে হবে। এটা যদিও বোকা-চিয়োর সারস ভাবনা তবু ঘুরে গিয়ে সুগন্ধ গোলাপ বা কোনো ডাল শুদ্ধ ফুল এর পেটে গোঁজা দেখলে যন্ত্রণা বোধ করি। আসলে এই গেইজ। তা না হলে কি আছে, যা প্যারসীভ করি আমরা···

ছাই ঝাড়বো বলে যা বেছে নিতে চাই দেখলাম মার করোটি হয়ে উঠছে। বহুদিন থেকে মাকে আমার আর বিশেষ ভালো লাগে না ; এক ধরণের কান্না মেশানো যন্ত্রণা বোধ করি। হতেই পারে ঐ একই জায়গায় এখন নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চলেছে স্ত্রী সত্যি কি হয় মানুষকে যদি দাহ না করা হয় ? অ্যাশট্রে শব্দটিকে লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, অর্থাৎ যে জীবনটা ফুঁকে ছায় বা

একটা শিশুর মাথা দুলছে ? না, তার পিতা তাকে কোলে করে দোলাচ্ছে, একটা যোনী ছাথা গ্যালো আকস্মিক। ভক্তিবশত যে বাদামী দেয়ালের দিকে তাকালাম দেখি সে নেই, সে অবস্থান করছে আমারই বিছানায়। যে অবস্থানে আমি নিদ্রা / রাত্রি যাপন করি ; ঠিক সেখানেই। আমাদের সম্পর্কের মূল উইটনেস দেয়ালের ঝুল ; ঝাড়তে গিয়ে পেরেক থেকে তাঁকে খুলে নামানো হলো।

এটা ঘটনা নয়। এটা বিজিত অন্ধকারে পুরস্থত অগ্নিবীনার ধূলি।

তিনদিন আগে যাকে পূর্বমুখ করা হয়েছিলো সে কালী নয় ; বীনাবাদিনী তার মাথার দু-দিকে দুই নগ্ন শিশু। ডানা আছে ; উড়িবারে তরে নয়। উড়িবারে তরে যে বা যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের মধ্যে আমরা পড়ি কি ? ঐ সমাজ এই সংসার বিচ্যুত আমরা, মনে হয় পড়ি। হে ঈশ্বর

উড়াও

উড়াও, মোদের

□

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির মা ও দাঁড়িয়ে আছে অদূরে ; মেয়েটির জনক কি দাঁড়িয়ে আছে পিছনে ? চিত্র সাংবাদিক জানে, অন্য কোনো চরিত্র কি ছিলো ? তা ও চিত্র সাংবাদিক জানে।

এমন আমরা মুখোমুখি নই। ছাই রঙা টেবিলের দুই প্রান্তে অবনত। আমার চোখে সান-গ্লাস নেই। সান-গ্লাস যা আড়াল করতে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আবেগ নয়। তবু সে একপাশে তার চশমা সরিয়ে রেখেছে। যা সান-গ্লাস ছিলো না। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না ?

আপনাকেও।

দুজনের অতীত-অশ্রু টেবিলে না পড়ে কাচে এসে লাগে। আমাকে সবাই ব্যবহার করে নিচ্ছে ?

আমাকেও ?

অশ্রুকনার মধ্যে দিয়ে রামধনু ফুটে ওঠে। আকস্মিক এই ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করছি আপনি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে যাচ্ছেন ?

দুজনের ফুটপাত কি আলাদা ছিলো ?···

বিপাশা পড়েছো ?

না।

কোনো উপন্যাসই এমন আমি পড়তে পারি না। তুমি তো দেখলে পথের পাঁচালী ৬৭ পাতা পড়ার পর আর পড়ে উঠতে পারলাম না।

কেন।

যেভাবে লেখাগুলো তৈরী করা হয় ?

কিছু কিছু জিনিষ সরিয়ে রাখতে হয় (হয়তো লেখাকালীন) ; একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী হোক বা না হোক। বেতার যন্ত্র, জলের পাত্র এই সব। স্থান পরিবর্তনকালীন ছাথা গ্যাছে, রোদ এসে সব কিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে। অর্থাৎ তাকে উদ্যোগী করে তুলছে। এটা হতেই পারে একজন সবক্ষেত্রে সার্থকনামা নয় ; জানলার শিকে দড়ি লাগাবার পর ছাথা

যাবে শিকটি উবড়ে এলো এবং সে মাথায় গুতো খেলো না। অর্থাৎ জেলে ঢোকাকালীন কেউ ভাখে না ইহা কবে স্থাপিত বা বলা যায় কুয়াশার যে আস্তরণ একজনকে কবি করে তা প্রকাশনায় অপেক্ষায় থাকে না। ফলে একজন গ্রন্থ দিয়ে চোখজোড়া ঢেকে নেয়। এঅর্থেই ঢেকে নেওয়া গ্রন্থটি পড়া হচ্ছে না। তা সেটা মিশেল ফুকোর দ্যা অর্ডার অব থিংস অথবা ফ্রান্সিস কুকায়ামাক দ্য এণ্ড অব ইডিওলজি। When the space of a lapsus no longer carries any meannig (or Interpretation), then only is one sure that one is in the preconciousness, দিনের বেলায় শবরীদের বাথরুমটা এতোই অন্ধকার বাল্ব না জ্বাললে হাগু করা যায় না। অকাল্ট ব্লাডের প্রশ্ন নাও উঠতে পারে তবু ভাবনা চলতে থাকে। আর এভাবেই একটা মানুষ প্যাথোলজিক্যাল একই সংগে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের পরীক্ষা দিয়ে থাকে। কি আর হয় একটা লোক যদি চেয়ার না ঘুরিয়ে বসেই কথার উত্তর দিয়ে থাকে। এরকম তো হয়তো ভাখাই যায় রোগী উল্টো দিকে মুখে করে ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে! ফলে এটা পরিস্কার মানুষ যা জ্ঞান করে তার মধ্যে নক্ষত্রনিচয়ের ভাবনা থাকে। যা শৈশবে নিয়মাবর্তিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে রাখা হয়।

□

মানুষ যদি তার কাজের জন্য অনুশোচনা করে, সবচেয়ে সুবিধা আধুনিক-কালের। কাল নামক শব্দটি নিশ্চয়ই কেউ এভাবে বিচার করবে না কলম তুলে আনতে গিয়ে ভাখা গ্যালো থার্মোমিটারের খাপ উঠে আসছে। আগুন শব্দটির সঙ্গে এক একজনের এক একরকম ভাবে পরিচয় ঘটে যাহা তাপ তাহা উত্তাপে নেই ধরা যাক চতুর্দিকে উই। মেরে ফেলছে একের পর গ্রন্থ! অন্যঘর থেকে ভেসে আসছে আবহাওয়া সম্পর্কিত সংলাপ। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, সবকিছুতেই অসম্ভব তেতো অথবা মিষ্ঠতা পাওয়া, এগুলো বিদ্যমান আরো অন্যান্য ব্যাপারের মতো। এই সেট এর বাইরে আর একটি সেট লক্ষ্য করুন সোফা সেটে বসে আছে প্রধানমন্ত্রী। কথাবার্তা হচ্ছে। দেয়ালের চিত্র লক্ষ্য করুন প্রধানমন্ত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষ জনের পোষাক-আশাক অর্থাৎ কোট ক্লান শেভড, মুখ, কোটের কাপড়, কলম, কাগজের চকচকানী

দরজার উচ্চতা। হ্যাঁ এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হোলো এই যে ডিফারেন্স এই যে হাইঅ্যারকি, ভাঙার কথা বলছি না যেভাবে বর্তমান তা ঠিক ঠিক ভাবে না বুঝলেউন্মাদ হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একবার বিদেশী চিত্র সাংবাদিক লেনিনের ফটো তুলতে এসেছিলো, লেনিন বলেছিলো এনার ফটো নিন। লোকটি ছিলো এক বৃদ্ধ কৃষক আজকে ওটা গল্প বলে অস্তিত্ব নেই। অনুশোচনা শব্দটা দিয়ে শুরুকরলেও ঠিক যে তা ব্যাখা করে উঠতে পেরেছি তা নয় একজন আমার ফটো দেখে বলেছিলো অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো। আমার মার শৈশবে স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁচ লেগেছিলো। ও ঘরের ধারে কাছে দিয়ে না গিয়েও একটা মানুষের চলে যায়; ধানক্ষেত আর চিমনির ধোঁয়া, দুটোই তীব্র উজ্জ্বল কবিতা। আসলে আকাঙ্ক্ষা যদি মানুষকে তাড়াকরে তা যেদিক থেকে হোক আবেগ বইতো কিছু নয়; তারপর একটা জীবনে মানুষের যে যে প্রযুক্তির সঙ্গেই পরিচয় ঘটুক না কেন সত্যি তা হাসির উদ্রেক করে। জাপানী রোবটের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার পর তিনি উপহার পেলেন আপন প্রতিকৃতি। যেমন ধরা যাক একটা লোকের ইদানিং একটা চোখ দান করার ইচ্ছে হচ্ছে। অথবা কিডনি। কুটনীতিকরা এভাবে বুঝবে লোকটি থেকে যেতে চায় (হাঃ হাঃ)।

□

সিঁদুরটা একটু বাঁ দিক ঘেষে লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো সৌন্দর্য্যের আপন স্বভাব যাই হোক না কেন মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসে। মাকড়সার যা দিনলিপিকা তার ব্যাখা দাস কাপিট্যালে পাওয়া গেলেও ঘুরে ভাখার মতো কিছু নেই। উইমারার ওষুধ কিনতে হবেই। বাল্মীকির কথা মগজে স্থান না দিয়েই দোকানটায় হাজির হয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর বিষ শুনে পিছিয়ে এসেছিলাম; কিসের আতঙ্ক জানি না; তবে কেমন একটা বোধ যেন। উইয়ের গ্রন্থপ্রীতির কথা সবাই জানে। ত্রিশ-বছরের মধ্যে একবারও টের পাইনি। ভুলকরে কাফকার ডায়েরীটা এক আত্মীয়কে দিয়েছিলাম। ফেরত পেলাম প্রেম-সহ (উই)। উইয়ের জীবন যতোই উৎসাহব্যঞ্জক হোক না কেন বড়ো ঘেন্না করি সিঁদুরের প্রতি যে অর্থে মানুষের অসীম ভালোবাসা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখালিখি এমন একটা সুরে অপছন্দ করতাম তাকে লিখে জানাতে লজ্জা করে কোনো এক গাঁয়ের বধূ শীর্ষক

বিভূতিভূষণের একটা ছোটো গল্প আছে, কুসুম চরিত্রটি যে ভাবে রচনা করেছেন বা বলা যায় রেখেছেন মনে হয় এক ধাপ্পা আছে। ঐ একই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে একটা ধাপ্পাবাজ মনে হয়। অর্থাৎ এরা কেউ যৌনতার কারনে ও দরজা মাড়াননি বলতে চান। যৌনতা কি অপবিত্র শব্দ? আজকাল মনে হয় এই ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখলে তাও আর একটা বিটকেল সমালোচনাই হবে। যে কারণে বিজ্ঞানে সমালোচনা বলে কোনো বস্তু হয় না। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তা আমাদের চেতনা দ্বারা কোন ভাবেই প্রভাবিত হয় না। বিজ্ঞান ভাবনা আজ আর এখানে নেই:

প্রস্‌টিটিউটরা কি সিঁদুর লাগায়?

কেন লাগায় না?

ধরা যাক একজন লাগাচ্ছে।

ধরা যায় একজন বাদ দিয়ে সবাই লাগাচ্ছে।

ধরা যাক সব বিবাহিত মেয়ে সিঁদুর লাগাচ্ছে।

— — — একজন লগোচ্ছে না।

নারীস্বর: সবাই কেন সিঁদুরের টিপ পরায়?

তার কণ্ঠের মালাটি শুকনো। সে একজন প্রতিমা, নারী নয়। মর্ডান সায়েন্স আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাইণ্ড এবং এই চরাচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে, এটা স্বীকার করে না। যা ক্ল্যাসিক্যাল বিজ্ঞান করতো।

মানুষ প্রতিরাত্রেই কি নতুন দৃশ্য অবলোকন করে? নতুন দৃশ্য বলতে কি বোঝায়, ঘুম ভেঙে দ্যাখা গেলো না সূর্য উঠেছে? জেগে জেগে দ্যাখা গেলো না চাঁদ উঠেছে।

গ্রহ / উপগ্রহ।

সবচেয়ে অপছন্দ করি সূর্যকে

সূর্য=উই≠নক্ষত্র=সিঁদুর

ভুল শুধু ভুল ঝাউপাতা নীরবতা

ভুল শুধু ভুল ভেজাকাক

ভুল শুধু ভুল তালাচাবি

ভুল শুধু ভুল

শাস্ত্রীয় আলাপ এভাবে হতে পারে না। অথচ কি অসম্ভব শ্রমের পর

মহাকাব্যিক ভাষায় উচ্চারণ রাখা হয় তা একদিকে যেমন অনাস্বাদিত থেকে যায় অন্যদিকে হয়ে ওঠে দূর অতিদূর অনধিকার চর্চা / রেওয়াজ। চোখটা শক্ত করে টিপে ধরলেই পার্থেননের কালো থাম, সাম্রাজ্য? না। শুধুই থাম, আকাশ চুম্বন করছে। মেঘলা আকাশ বলে যেটা বর্ণনা করা হয় সেই ত্রিকোণ ঘরটির মাথায় একটি পায়রাই ভিজছে। ভিজে চলেছে। আর একটি পায়রা এলেই সংবাদটা জমজমাট। তার জায়গায় ঢুকে পড়ছে বসুন্ধরা বৈঠক। Man's greatness comes from knowing he is wretched; a trec does not know it is wrietched. Thus it is wrctched to know that one is wretched, but there is grcatness in knowing one is wretched (397) পাস্কাল

> আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না আমার ফুরাবে না এই
> জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা···

বিবেকানন্দের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিলো, আমি জানি না, আমি বিশ্বাস করি একদৃষ্টে কেউ যদি কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করে রক্ত সঞ্চালন শুধু ব্যহত হয় না, তার মগজে এমন ক্রিয়া চলতে থাকে জগৎ বিশ্বসংসার অনিত্য বোধ হতে পারে এবং যার ফলে মৃত্যু অনিবার্য। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন দ্যাখাচ্ছে আমাকে? সে প্রথমে বললো পরিতৃপ্ত, পরে বললো অসুস্থ। কার্যকারণে মূল বুননটা যদি ভুল হয় তবু আমি বলবো সাধারণ মানুষ তা অনেক আগেই বুঝেছিলো তার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিকসের আস্ফালন করার কিছু নেই। যা অশাস্ত্রীয় তাই সঠিক, শাস্ত্রীয় চর্চা মৃত্যু চর্চার এক রূপ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা পরিজ্ঞাত জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান।

মাকড়সাটা শেষপর্যন্ত ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়লো। অর্থাৎ সে কি কোনো ফ্রেমের মধ্যে ছিলো না? নিশ্চয়ই ছিলো তবে তা বিমূর্ত। এবার সে যার মধ্যে প্রবেপ করলো সে বিমূর্ত নয়। আমাদের সম্পর্কের বিমূর্ত সাক্ষী, তোমার কি মনে হয় ঐ পতঙ্গটি তার সৃষ্টি? তা কিভাবে সম্ভব? প্রথমে পেছনের বাদামী কাগজটা খেয়ে ফেলবে, মাকড়সা কি কাগজ খায়? না কি সে বাসা বাঁধবে? এবং রক্ষা করবে ওই ফ্রেমটাকে ছোটো ছোটো

পোকাদের হাত থেকে? তাও কি সম্ভব? আসলে তুমি একটা সময় ভেবে নিয়েছিলেই বিমূর্ত সাক্ষীটির চোখ, তার নাক এবং সে-ই জিহ্বাকে যে কারণে সে অন্যান্য সাক্ষীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার অনন্যা সত্তা আমাদের কাছাকাছি এনেছে বলেই আমরা লেনিনের ফটো টাঙাইনি। অর্থাৎ আমরা লেনিনের উপর নির্ভর করতে পারিনি।

□

কা
ঠে
র
রে
লি
ঙ;
আমার মা

জল দিয়ে গোটা রেলিঙটা ধুয়ে ফেলার পর, কার কনুইয়ের অপেক্ষায় আছেন তিনি; আমি জানি না, যেসব পায়রা এবং পাখী ক্লান্ত হয়ে এসে বসতো, তারা কারু হৃদয়ের ফল কি না তাও বোঝা যাচ্ছিলো না তাকে দেখে, কতোদিন ধরে এভাবেই ধুয়ে যাচ্ছেন, তাও জানি না। তবে এটা পরিস্কার বুঝতে পারি রেলিঙের ওপর কনুই ঠেসে চমৎকার সূর্যাস্ত ছাখা যাবে। যা মানিক বাবুর জানা আছে। শহরতলীর মানুষরা সূর্যাস্তই দেখে থাকে বলে আমার বিশ্বাস। শনিবারের বিকেলবেলা চৈত্র মাসে যেসব মিনি বাসে দাঁড়িয়ে আসতাম ইচ্ছা হোতো সূর্যাস্ত ছাখা যেন শেষ না হয়।

সাধের রেলিঙ স্ত্রী আমার এভাবে সম্বোধন কালে প্রথমেই যা উঠে আসে, কাঁধে চুম্বন, পায়ের কাছে চায়ের কাপ। ফলে ঘুরে দাঁড়াতেই হয় এবং আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে নিদ্রা এবং স্বপ্ন। ফলে

আমি
যা জানি
সর্বান্তকরণে ভুল জানি। আর এর জন্য আমি গর্বিত।

শিশু অনুকরণ প্রিয় নয়। অভিনয় প্রিয়, চশমা পরে স্নান করা অথবা মল ত্যাগ পোষ্ট মর্ডানইজম অথবা আধুনিকতা। প্রাজ্ঞ শব্দের বুৎপত্তি একজন রাজার

পেনরোজের না জানলেও চলবে। যদিও লোকটির কাজকর্মের প্রতি আমি আস্থাশীল। কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম বুঁড়ির আলু কমে যাচ্ছে ইঁদুর টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লোলিতা পড়ছে লোলিতা বললে গারট্রুড স্টাইনের কথা মনে জায়গা পায় না। অথচ লিওতার্দ পড়া আক্ষরিক অর্থে জরুরী বুঝতে পারছি। ভ্রূণ বললো চিন্ময়ীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ কোনো নার্সিঙ হোমের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। পাখি কি ফিচেল! যদি হয়, বরাহ মহাজ্ঞানী। লিঙ্গপুরানে এ কথা নেই উত্তর ভারতকে পূর্ব ভারতের ইন্দোই বলে। দ্রাবিড় বলে যা বিজ্ঞাপিত, তা মূলত যৌন-পুরান। বাল্মীকিকে গলায় দড়ি দিয়ে যেখানে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হচ্ছে তা বধ্যভূমি নয়; টি. ভি. সিরিয়ালে। রামায়ন যে একটি সাহিত্যকর্ম পোষ্ট-মর্ডানিষ্টরা অবিশ্বাস করে না। আমোদটি তবে কোথায়?

আপনার কটি ছেলে মেয়ে?
একটি।
আপনার কটি মেয়ে ছেলে?
জানি না।

প্রস্তুতি এবং প্রাক-প্রস্তুতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে দুজন। একজন বিবাহিত ছিলো; অন্যজন চা প্রস্তুত করছে।

স্বপ্ন ১

একটা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের কাছে না গিয়ে ছাখা যাচ্ছে এই পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি কৌটো থেকে সর্ষেতেল পড়ার ন্যায় এবং যা সে ঘুরিয়ে দিতে চায়। [কোথায়]? মহাকাশে?

আসলে স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন বলে চিহ্নিত করতে চাইছে। বা জড়িয়ে ধরতে চাইছে। স্বপ্ন শব্দটি প্রতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠার আগে ছাখা গ্যালো যে সকল চিংড়ি উত্তর পাড়ার রেল-লাইনের ধারে ১৬০ টাকায় বিকোতে শুয়ে আছে তারা বিশ্বব্যাঙ্কের লগ্নীপুঁজির ফসল নয়, অতএব।

একটা লোক সমুদ্রের দিকে যায়।
একটা লোক কোথাও যায় না একটা লোক কারখানায় দিকে যায়।
একটা লোক কোথাও যায় না চেয়ে থাকে শুধু চেয়ে থাকে…

□

দূরে এসে বোঝা যায় অন্ধকারের মাংস কতটুকু হজম করা যাবে। একজন ফিজিওলজি না পড়েও ভালো ডাইজেষ্ট করতে পারে বলেছিলো হেগেল। আংশিক পড়ে বুঝতে পারছি গোটাটা না পড়া কতোটা বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকেই প্রায় পড়ে শেষ করে ফেলেছে। আরো অনেক বিষয় পড়ে শেষ করে ফেলবে। যেমন বায়োকেমিস্ট্রী। নিরাপত্তা নিয়ে বেশী চিন্তা করাটা এরকমধরণের এম্পিরিক্যাল অথচ এই বয়সে কংগ্রেস (ই) কে অর্থাৎ কংগ্রেস কালচারকে অজান্তে যে কতোটা গ্রহণ করেছি কে জানে! মায়াবন্দরের এক কমরেডের বক্তৃতা সারাদিন এর্বাডিন বাজারে শুনতে শুনতে মনে হোলো কম: কানাইয়ার থেকে আমি কতদূরে। সভাটি সি. পি. আই (এম) এর স্টেট কমিটির ওপেন সেসন। কালাপানি পান করা লোকদের উৎসাহ কিছুটা যে কি দিলো তা কে জানে, করবাইনস কোভের টেউয়ে যা নেই।

বাড়ী ফিরে নতুন করে শুরু করতে হবে। দৌড়োদৌড়ি ঠিক নয়। যদি না সবাই দৌড়োদৌড়ি করে।

রেডিওয় শেষ গান শুনেছিলাম: কাছে ছিলে দূরে গ্যালে, দূর হতে এ'সা কাছে ভুবন ভ্রমিয়া তুমি,....

এখানে রবীন্দ্রনাথ নেই। অথচ বেতার তোমার কণ্ঠ এখানে আছে। অর্থাৎ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফিনিক্স জেটিতে একজন নাবিকের সঙ্গে আলাপ হোলো। কলকাতায় জিনিসপত্র খুব সস্তা বলে কান্নাকাটি করছিলো। চলে যেতে যায় অথচ ঘর নেই। ঘর খুব মূল্যবান তার ধারণায়। আমার ধারণায় কি মূল্যবান; নিকটজনের কাছে থাকা? না কি সবাইকে নিকট করে নেওয়া, কিভাবে নিকট করা যায়?

প্রিয়রঞ্জনের কাছে হেরে যাওয়া সময় মুখার্জিকে মাঠে দেখলাম। তার বক্তৃতার অপেক্ষায় সবাই। এই ইম্প্রেশন ভোলবার নয়। যখন বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিলাম শুনতে পেলাম মমতা ব্যানার্জীর বক্তৃতা। যতোটা গভীর তার চেয়ে হৃদয় গ্রাহী। অফিসের একজন কংগ্রেস সমর্থক সিগারেট বরাবর দু-টুকরো করে খায় আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি নেশা কম করতে চান? না কি অবস্থাটা; আন্দামান ও নিকোবারের ঘটনা এই, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘর নিয়েছি অথচ পাশে গ্রন্থ নেই রাজনীতি নেই দুর্নীতিও নেই।

এখানে আসার আগে গোর্কিসদনে যুক্তি তক্কো আর গল্পো দ্বিতীয়বার দেখতে হলো। নিজের মুখে শিল্পী নিজেকে কনফিউসড্ বলেছে। আমি কি বলবো। কবে থেকে বিকারগ্রস্ত জীবনে রয়েছি। অধিকারের শিকড়টি কার বা কাদের সময়ের কোঠায়?

যাক আন্দামানেও ব্যাঙ্ক আছে। এবং তারা...

আমার চেয়ে সরীসৃপকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। এবং করে যাবে হয়তো, এখানে কেউ কেউ নিজেকে কলকাতায় লোক বলে, চেপে ধরলে স্বীকার করে; এসেছে জামশেদপুর থেকে। টাটার মাহাত্ম আছে নিশ্চয়ই। অথবা দুর্গাপুর; এটা নাকি রেওয়াজ (তবে আওয়াজ তোলো আন্তর্জাতিক না কি তোমরা হোমরা চোমরা সত্যজিতের কামরা।)

জেটি। রিটেল প্রাইস পার কেজি সোরামাইন ১৫ টাকা, পার্শে ১৬ টাকা তুমি এতো নীচে নেমে গ্যাছো। (তোমার উচ্চতা দেখে ঈর্ষা হচ্ছে রাধানাথ শিকদার।)

হোটেলের সিড়িতে বসে আছে। পাইস হোটেল। গন্ধ বেরোচ্ছে ফুলকপি দেওয়া কইমাছের ঝোল থেকে। কখনো জুতো খেয়েছো? আমি তোমাকে ডেকেছি।

ঠাসা চুল আর গোঁফয়ালা ঈশ্বরকে কেনা পছন্দ করে।

চা হবে?

নেই।

ঠিক আছে পার্কে চলো।

পার্কে?

আমাকে কেউ ডাকে না। তাকালে ডাকে, মিষ্টি খেতে চায়।

জঙ্গীপুরে কতদিন বন্যা হয় নি?

জেটিতে শুকোচ্ছে ভেটকি। যাদের পেটের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে সিবি আইয়ের পাণ্ডুলিপি: প্রতিটা মানুষ খানকির ছেলে

□

ফ্রিফল গ্র্যাবে টেকনিক ড্রেজিং কসমিক ফেরিউল রাষ্ট্রপুঞ্জের সি-বেড

অথরিটি খবর শুনে হাসার কি হোলো নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝি রাষ্ট্র বুঝি, বুঝিনা তার অথরিটি হে হে হে। মুস্কিল হোলো তোমাকে বলে ; অনুবাদতো এটা, হে হে হে তুমি কি এগুলো ঘেন্না করো ?

আমার ঘেন্নায় কি যায় আসে আমাদের ঘেন্না বললে হয়তো একটি এফেক্ট আছে যে রকম নেরুদা মার্কেজ নাকি সে দেশের কখনোই প্রতিনিধিত্বমূলক কবি ব লেখক নয় (বুঝলাম না।) সমুদ্র আমাকে টানে অবশ্য, মহাশূন্য যাদের টানে, মাছি যাদের আকর্ষণ করে, প্রেস কালচার তাদের টানে (পুঞ্জাক্ষি)।

□

ভ্রমণ—অতীতের কথা ভাবলে ঝিমিয়ে পড়ি লোহার রেলিং ভেঙে ইটের দেওয়াল, কুয়াশার মধ্যে সাদা পায়রা নেমে আসছে গালীবের দরজায়। সে নয়। গনগনে আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে থাকা কয়েকটি বাচ্চা, বেরাল ভেবে ভ্রম হয়।

ওকে দেখে তাকে মনে পড়লো। তাকে দেখে কিছুই মনে পড়েনি। কেননা তার পিছনে হচ্ছে পাহাড়, রেসকোর্স, দালাল ষ্ট্রিট। এটা হতে পারে তার কোনো পোষাক নেই। গন্ধর পুতুল। আমি চেয়েছিলাম সে মাথা নীচু করে বলবে : আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর উত্তরগুলো এভাবে দেবো : ভেবে ছাখো, এজন্মে না হোক সামনের জন্মে চাও কিনা : ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমতির ম্যানিফেষ্টো গরম ভাতের সঙ্গে মেরে দিতে হোলো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওকে কার মতোন।

ফুলস্লীভ সোয়েটার, পায়ে মোজা এক কথায় বিছানা থেকে যে নামতে চায় না।

□

ট্রেনে যেতে যেতে দৃশ্য সরে যাচ্ছে বেশ লাগে বড়োবাবু বললো,

□

মেজবাবু বললো নৌকোর পেটের মধ্যে বসে জলে হাত দিতে বেশ লাগে।

□

সেজবাবু বললো কবে যে উড়োজাহাজে চড়বো।

□

ছোটোবাবু ওকে তুলে নিলো, নাম রাখিলো পথিক।

বন্দিনীকে ভালোবাসলে খুব তৃপ্তি হয়। মহান কাব্য হয়। আর ম্যানিফেস্টো হয় যদি বন্দিনী উপাধি দেওয়া হোক বেশ্যাকে। এভাবেই অজন্তা ; মোড়ামুড়ি করলো এ যুগের সীমা রায়। ৩০০০ কিমি থেকে ভায়া অজন্তা অজন্তা এ পাড়ার সিনেমাহল, ও পাড়ার সার্চলাইট (স্বর্গের আলো) ৪ টাকা ২০ পয়সা। বুকের গভীরে যাকে ডেকে নিলাম সে চেজমী, ট্যালকম পাউডার। (সব কিছু বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের যুগ এটা)। আমার কিছু দেওয়ার নেই তাকে অর্থাৎ সীমা রায়কে। যারা পৃথিবী বাসযোগ্য হলে আমাদের মতো পোকা গরাদের দেয়ালে থেতলে দিতো। হোয়াইটওয়াশ যাকে ভ্রষ্ট করে। কি অপূর্ব কি অপূর্ব মুখে জল আসে বলতে বলতে যারা প্রকৃত নগ্ন হতে পারে হয়তো তারাই শিউরের লাল আলোকে তোয়াক্কা করে না। খুব ভালো বুঝেছিলো নিবেদিতা। অথচ ফোঁসকরার আরেক নাম মহত্ত্ব। খুব কষ্ট হচ্ছে বেশ্যাকে বন্দিনী বলতে পারছি না বলে তা নয় ; কিভাবে মানুষ দূর করবে দূর করে যাবে ওই শৃংখল থেকে।

বিয়ে করেছো ?

না। কেন ? কি মনে হয় তোমার ?

কি জানি।

তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে।

তোমাকে আরো সুন্দর দেখতে।

কিন্তু চিনতে পেরেছো তো ?

□

তোমার দুর্বলতাটা জেনে গেলাম। আর ওর দুর্বলতা কি জানো

চশমাটা খুলে নেওয়া, অর্থাৎ সে জানে। সে জানে না কেন সন্তান শিশু শ্রমিকে পরিণত হয় না। কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে কুয়োর মাথায় উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে নেয় মৃত্যু।

সে জানে শরীরে হাত দেওয়া আরাম ও অপরাধ। সে জানে শরীরে হাত না দেওয়া যৌনতা ও পার্টিবাজি দুই বিশেষ্য।

আমি চেয়েছিলাম তাকে একটা উপহার দিই।

উপহার ধুলোয় এবং ঠোঁটের উপর এই সহাবস্থান কে না জানে। আজ যাহা ধুলো কাল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাবলাম একবার ফোন করি। জড়িয়ে ধরার জন্য যা যা ছাড়তে না জড়িয়ে যে ব্যবস্থা বহাল: সেইখানে কার মুখ কার চশম সমস্ত ইম্প্রেশন থেকে স্বাধীন হওয়ার অপেক্ষায়।

না। পারিনি, এখনও পারিনি। কাল পারবো বলে যে প্রকাশ ভঙ্গি ছিলো আজ তাহা সাহিত্য। প্রত্যাখ্যাত একাডেমী শিশির ভাদুড়ী। রোদে পড়ে আছে সোভিয়েত-নারীদের নগ্ন উরু।

সাংবাদিকতা চেটে খাচ্ছে।

কতগুলো ক্রিয়াপদ খুবই জরুরী। বের করা, ঢোকানো, হাসা কতগুলো ক্রিয়াপদের প্রয়োজন নেই বলেছিলো সে : খাওয়া শোওয়া।

সুব্রত বলেছিলো তুমি নাকি সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট।

কিন্তু আমি কোনদিন ভালো রেজাল্ট করিনি।

সো হোয়াট আমিও করিনি।

সো হোয়াট। কেউ করিনি। কস এণ্ড এফেক্ট। প্রথমে শুরু করে-করেছিলাম Field Law দিয়ে আমি উড়ে যেতে চাই কোথাও।

আমিও (4 dimensonal) physical space has a RIEMANNIAN matrix.

তোমার কাছে অবিজ্ঞান হয়ে থাকতে চাই।

The whole of sciencc is nothing more than a refine-ment of everyday thi king

এতো রেকারেন্স টানছো কেন?

টেক্সট। জানিনা।

□

স্বপ্ন ২.

কারা যেন র‍্যাক থেকে রুই নামাচ্ছে মুখে কাপড় চাপা দেওয়া। ঘাম বেয়ে একটা গন্ধগোকুল ছোটাছুটি করছে, অদ্ভুত এক কণ্ঠস্বর। লেনডিঙ কার্ডটা মুখে নিয়ে জানালার কাছে চলে যাচ্ছে।

স্টেশনে কারা যায়? বন্ধু? বাবা? মা? ইশ্বর? কেউ যায় না সিরিঞ্জের সুঁচটা মাঝপথে খুলে যায়। ডাক্তারবাবুরা প্রচণ্ড ভয় পায়, নার্স ৫০ ভাগ ভয় পায়। আমি ভয় পাই না রক্তের ফোঁটা গল্পের মতো সাদা চাদরে পড়ে না। মেঝেতে পড়ে, আরশোলা চাটে। চেটে যায়। আত্মহত্যা করার কোনো প্রকৃষ্ট সময় নেই। পেটে বাচ্চা নিয়ে মহিলাদের হেঁটে যেতে যেমন কোন লজ্জা নেই।

□

একটা লোক কারখানার দিকে যায়।

একটা লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়।

একটা লোক সমুদ্রের দিকে যায়

একটা লোক কোথাও যায় না শুধু ভাবে.....

আপনারা ঐ মানুষটিকে লক্ষ্য রাখুন। শান্তির পায়রাগুলো উড়িয়ে দেওয়ার সময় ভেবে নিয়েছিলো কালকের জন্য পায়রা মজুত তো!

রত্নদীপ ঘোষ

স্যাণ্টা ক্ল্যজ এবং রাতের গাড়ী

দুনিয়ার বেহেস্তে যাওয়া সভ্যতাকে কাঁধে করে এগিয়ে চলেছে কোকোগ্যান আমেরিকান জাভেদা। নিরোগ বলে দাবি করা সরকারি কুকুরগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখে লেবেনচুস খেতে মন করে। অতি সহজে নেমে আসে মেঘ। হেঁটে বেড়ায় রাস্তার চৌকাঠ বেয়ে, কোথাও এদের রং সাদা কোথাও কালো আবার কথাও ভবতারীনীর আখড়া। অকারণ কে কারণ দেখিয়ে দুষতে থাকে নিয়মিত টাইমপিস। রেজাল্ট না জেনে কেক খেতে গিয়ে ধরা। উর্দিপরা রেকাবি এবং সাধারণ সিঁড়ি সবাই গাছের ফিল্টারে পিন দেয়। কারুর নিয়োগ বা বিনিয়োগে খুশি খালি।

এমনিতে শোনা যায় পুলিশের খাতায় নাম তোলা ব্যাক্তির পরিচয় সে "দাগী"। এমনই এক দাগীর নাম 'লাল'। থাকে লেনিন সরণীতে। অদ্ভুত যোগাযোগ কেউ দেশের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছেন বিপ্লব করে আর লাল পরের দুঃখে কাতর হয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। এক সময় এই ছেলেটি দার্জিলিং কনভেন্টেএ পড়ত। প্রায় দশ বছর পর বাড়ী

ফেরে চোখের সামনে দেখতে পায় পরিচিত সমাজের বিবর্তন। মানুষের নোলচে পরা জানওয়ার কি মজা করেই না ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে রাম। বন্ধু তাকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হয়েছে আর তার বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সওদাগরের ভবের বাজারে হারিয়ে গেল লাল। তুলে নিল তার অস্ত্র "আস্তরা"। মেরে ফেলল সমস্ত দুষমনদের কিন্তু হঠাৎ পাঁচ বন্ধু একদিন পুলিসের ফন্দীরে পড়ে চলে গেল তালতলা লকাপে। বাইরের মানুষগুলো তাদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলো ভিতরের জানওয়ার গুলোর কথা। দুর্ভাগ্যবসত আমিও ছিলাম সেই তীর্থ যাত্রায়। লকাপের দরজা খুলতেই দেখলাম একটা সুদর্শন যুবক অন্য একজনকে খুব মারছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার আর চার বন্ধুকে বললাম, একে বলে "ধুর ক্যালানি' মানে আমরা যারা ঢুকাছ ভিতরে হলাম ধুর অর্থাৎ এই 'দাগী'রা আমাদের মেরে ওদের প্রভুত্ব প্রমাণ করবে। আমার আরেক বন্ধু বলল একে কি টেক্‌আপ অফ রিলেশনদিপ বলে, জবাবে নীরব থাকলাম জানিনা কি হবে। আমাদের সাথে আরো ত্রিশজন ছিল। তারাও একে একে ভিতরে এল। যে ছেলেটি মারছিল সে এবার তার সিংহাসনে এসে বসে পড়ল। তার নিজস্ব কম্বল পাশে দুটো সিগারেটের প্যাকেট একটা ফিলটার উইলস আরেকটা ক্যাপস্টেন। আমাদের মধ্যে সব থেকে নরম ধাতের ছেলেটি ততক্ষণে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। আসলে গাড়াতে তোলার সাথে সাথে আমরা ঠিক করেছিলাম কেউ নিজের আসল নাম এবং ঠিকানা বলবনা। ডায়রীতে সেই অনুযায়ী যে যার লেখার ছদ্মবেশি নাম প্রয়োগ করি কিন্তু লকআপে ঢোকার সময় কোন একটা চাপ বসত ওই নরম ধাতের ছেলেটি তার নিজের আসল নাম এবং ঠিকানা বলে দেয়। অর্থাৎ আবার তার মাথায় ক্রাইম রিলেশনসিপ ঘটে যায়, একে একটা অকারণ অপরাধে এখানে এনেছে তায় মিথ্যা কথা, মানে ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় যে ও ছাড়া পাবে না। আমরা ওকে প্রচুর বোঝানের চেষ্টা চালাই। হঠাৎ একটা সকারান্ত ভাষা কানে আসে, ঘুরে দেখি আমার কেতু বন্ধুকে সেই মারকুটে ছেলেটি ডাকছে, ও তাকানোর সাথে সাথে ছেলেটি বলে ওঠে "কাদছিস কেন আধ ঘন্টায় ছেড়ে দেবে, পয়সা কড়ি আছে কাছে," আমরা সবাই জানি নেই ওকেও তাই বললাম। ও আমাদের কাছে ডেকে নিল। নানান কথিত কুপরামর্শ দেবার পরে কেমন যেন ওকে ভালো লাগতে

আরম্ভ করল। মায়ের কবরের গাড়ীটার পেছনে দৌড় থেকে আজ অবধি কাণ্ডকারখানা। ভদ্রঘরের ছেলেরা এক রাত হাজতে থাকবে বড় সহ্য হল না। সেন্ট্রি এবং মুহুরীকে ডেকে বন্ধুর বিয়ের সোনার আংটিটা জমা রেখে আমাদের ছেড়ে দেবার জন্য হুকুম করল; বুঝলাম কতটা প্রভাবশালি হতে পারে মানুষ। আমাদের ওর খাবার থেকে খাওয়াতে লাগল। রাত ১২টায় সভ্য জগত থেকে বেরলাম ভদ্রলোকের নষ্ট কারখানার মাঝে। বেঁচে থাকার আমিত্ব ততক্ষণে প্রকট সবার মনে। ক্রেমলীন শহর থেকে কলকাতা কাঁপছে নরমে গরমে। কাঁধের ক্যামেরাটা সাবধানে রেখে দিতে বলল মিউজিয়ামের সামনে চোরের দল তাদের ভয় উর্দি পড়া পুলিশদের। অতঃপরে বাড়ী ফিরলাম। তবে মনে গেকে গেল যিশুর জন্মদিনে স্যান্টাক্লসের দেওয়া সব থেকে বড় পুরস্কার।

□ একটি চিঠি

রঘুনাথপুর / পুরুলিয়া

৭/৯/৯২

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। প্রথমেই একজন মানুষকে তার বয়স-টয়স না জেনে তুমি, সম্বোধন কী সমীচীন? আপনি তাই করেছেন। আধুনিকতা মানে কি এই?

আমার কবিতা আপনার ভালো না লাগতেই পারে। এ প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার নেই।

তবে আধুনিক বা ইদানিংকালের কবিতা ও তার বাঁকগুলি যে একদমই বুঝি না তা কিন্তু নয় বোধ হয়। সাবনয়ে জানাই 'দেশ' (মে ২য় সপ্তাহ '৯২') এ আমার "কৃষ্ণনাম" কবিতাটি কষ্ট করে পড়বেন। আমি এ যাবৎ বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর প্রায় তিনশো কাগজে লিখেছি। যেমন, প্রতিক্ষণ, দেশ, কৌরব, কোরক, বেনুকা, মধ্যরাত্রি, পুনর্বসু, মেলা নির্জন—আরো অজস্র কাগজে। একটি কবিতা মানে তো একটি নতুন সিদ্ধি। ফলে, দৈন্যতা থাকলেও এ রচনায় নিশ্চয়ই তার ছাপ হয়তো আছে। আমার এ যাবৎ তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত। বইগুলি আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল প্রায় প্রথম শ্রেণীর মত দৈনিকে আলোচিত। কেউ কিন্তু বলেননি 'আধুনিকতা নেই।'

যাই হোক, আপনি আপনার কথা অকপটে জানিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। লেখা ছাপানোটাই তো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

যোগাযোগ বাড়ুক। পত্রিকায় আদান-প্রদান হোক। আমরা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই।

ইতি

দেবাশিস সরখেল

২৬. ৮. ১৯৯২

প্রীতিভাজন,

তোমার লেখা আমরা পেয়েছি। দু-একটি শব্দ বাদ দিলে লেখাটির বিশেষ কিছু নেই। খুবই প্রথাগত, সামগ্রিক বিচারের কবিতা হয়ে ওঠেনি। আধুনিক কবিতার সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও তোমার নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা তোমার অ-কাব্যিক উপস্থাপনা। ১মে আমরা ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো চাকুরীর দরখাস্ত। যাই হোক ঠিকানা লেখা পোষ্ট কার্ডও পেয়েছি। সবচেয়ে কদর্য রবার-স্টাম্প মারা Address। এটা কি তোমার আধুনিক মননশীলতার দিক? যদি হয়, তা আমাদের আহত করেছে। ১ম কবিতাটির বক্তব্য অবশ্য কিছুটা আমার (শ্যামলতরু) ভালো লেগেছে। যাই হোক দুটো কবিতার সাহায্যে কবিকে বোঝা যায় না বলেই বিশ্বাস, ভালোবাসা নিও।

ইতি

বিঃ দ্রঃ

কবিতাটি পাওয়ার পর যে চিঠিটি দেওয়া হয়েছিলো

সোমালিয়া ঃ ভক্ষক যেখানে রক্ষকের মুখোশে

কোন একদিনের গল্প। রক্তিম সূর্য্য ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হচ্ছে পূর্বদিগন্তে। হিমেল সকালে সোমালিয়ার ছোট্ট শহর বরদেরায় ইউনিসেফের লঙ্গরখানায় ভিড় করেছে কঙ্কালসার এক বিশাল জনতা। প্রত্যেকের হাতে তোবড়ানো এল্যুমিনিয়ামের পাত্র। অনেক আশা যদি একপাত্র বাদামী লপ্‌সি মেলে। চার সপ্তাহ ধরে রোজ আসছে মানুষের মিছিল দূরদূরান্তের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। চওড়া রাস্তায় ধূলোর ঝড় উঠেছে বুভুক্ষ মানুষের পায়ে পায়ে।

অপেক্ষমান জনতার অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। তাদের স্বামী বা বাবার অভিশপ্ত অন্তর্ঘাতী লড়াইয়ে হয় মারা গেছে না হয় আত্মগোপন করেছে নিরুদ্দেশ কোন ঠিকানায়। বিশ বর্ষীয়া মা পাঁচ বছরের শিশুকন্যার হাত ধরে এসেছে বহু মাইল পথ হেঁটে জুবা নদীর উজান ধরে। দু'মাস ধরে স্বামীর

সঙ্গে দেখা নেই। ছোট দু'টো শিশু ক্ষুধার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি নিয়েছে আগেই।

বিরাট শোরগোল ধাক্কাধাক্কি। লঙ্গরখানার লাল লোহার গেটটা আর্তনাদ করে খুলল একটুখানি। কোনরকমে একজন ত্রাণকর্মী বেরিয়ে এলেন দরজা দিয়ে। ভেতরে পুরোদস্তুর যুদ্ধের পোষাকে বারোজন সোমালী রক্ষী, হাতে এম-১৬ রাইফেল। লম্বা লাঠি নিয়ে চলল কালো কালো হাড় জিরজিরে মানুষগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কসরৎ। জনতার কাতর চোখ ভেতরে রাখা বিশাল লপ্‌সির ড্রামের দিকে। ধৈর্য্যের বাঁধ মানে না। ধাক্কাধাক্কি করে ভেতরে ঢুকতে চায় মানুষ। অমনি মহিলাদের পিঠে সপাসপ্‌ লাঠির শাসন। রক্ষীরা হুঙ্কার ছাড়ে। আপাততঃ শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

বরাদ্দ হল জোয়ার, বীন আর ভোজ্যতেল দিয়ে তৈরী দু'পেয়ালা গরম বাদামী রংয়ের লপ্‌সি। সাথে প্রোটিন বিস্কুট। মুমূর্ষদের জন্য সংথায় দু'একটা বেশী। খাওয়ানো শুরু হয়। হঠাৎ এক বৃদ্ধা ছুটে সামনে আসতে চায়। অনিচ্ছাকৃত ধাক্কায় ছোট্ট মেয়েটির হাত থেকে পড়ে যায় ধুমায়িত র‍্যাশন। যন্ত্রণায়, রাগে মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। গরম লপ্‌সিটা গায়ে পড়ে পুড়ে গেছে। তার চেয়েও বেশী দুঃখ দিনের একমাত্র খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবার।

সূর্য্যটা মাথার ওপরে উঠছে চড়চড় করে। পাঁচ বছরের ছেলেটা প্রোটিন বিস্কুট হাতে নিয়ে চলে পড়েছে মাটিতে। দু'জন রক্ষী ছুটে গেল তার কাছে। কাঠির মত হাত দু'টো ধরে টানতে টানতে ভিড়ের থেকে দূরে একটা গাছের ছায়ায় শুইয়ে দিল তাকে। আর কোনো দুর্ভিক্ষ ছুঁতে পারবে না তাকে, কখনও কোনোদিন।

অর্ধচেতন কঙ্কালসার দু'টো মানুষকে পাওয়া গেছে শহরের বাইরের রাস্তায়। তাদেরও উঠোনের বাইরের গাছের ছায়ায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনদিন দু'রাত্রি হেঁটেও আর শেষরক্ষা করতে পারেনি। হয়ত আর কিছুক্ষণ পরেই মুক্তি পেয়ে যাবে।

উঠোনে গাছের ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। শেষ শিশুটি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ত্রাণখাদ্য নিয়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল লঙ্গরখানার দরজা। বাইরে ঘন অন্ধকারে মহিলা ও শিশুরা ইতস্ততঃ আশ্রয়ের সন্ধানে গাছের নীচে জড়ো হচ্ছে। পরের দিন প্রথম

সারিতে স্থান করে নেওয়ার জন্য শুরু হয়ে গেল নতুন প্রস্তুতি। "আগে রোজ চল্লিশটা মরত, আজ তবু ছ'টা"—নিজের মনেই স্বগতোক্তি করলেন নির্লিপ্ত শিবির কর্ত্তা।

ছবিটা দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত পূর্ব আফ্রিকায় দেশ সোমালিয়ার। সভ্যতার লজ্জা, মানবতার লজ্জা—একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে বুভুক্ষা গ্রাস করে নিতে চলেছে আধুনিক বিশ্বের গোটা একটি দেশকে। উন্নত দেশগুলির প্রাচুর্য্যের পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে কেন এই নিদারুণ দারিদ্র? জবাবটা খুঁজতে হবে আজকের সভ্যতার বিবেকের কাছেই।

সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষের জন্য নিছক প্রকৃতিকে দায়ী করা শক্ত। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আজকের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির জটিল ইতিহাস।

এই ইতিহাসকে খুঁজতে হলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯৬০ সালে সোমালিয়া স্বাধীন হওয়ার পর দেশে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়। ব্যর্থ হয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। প্রায় দশ বছরের অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন মেজর জেনারেল সিয়াদ বারে। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। গঠিত হয় সামরিক ও পুলিশ অফিসারদের নিয়ে সুপ্রিম রেভলিউশনারী কাউন্সিল।

এ ছিল নিছক একটা ভড়ং। সোমালিয়া কিছুদিন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলল। কিন্তু ১৯৭৪-এ ইথিওপিয়ার 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর পর ধীরে ধীরে সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলে চলে আসে। ১৯৭৭ সালে মার্কিন প্ররোচনায় ইথিওপিয়া আক্রমণ করে সোমালিয়া। শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করতে হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ হাজার হাজার সোমালিকে বাস্তুচ্যুত করে, সৃষ্টি করে খাদ্যের জন্য ব্যাপক হাহাকার।

সেই থেকে সোমালিয়ার বুকে দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণকর্মসূচীর সূত্রপাত।

তৎকালীন ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্য ছিল বারের সেনাবাহিনীকে খাদ্য যোগানো। টন টন খাদ্য চুরি করে নিত বারের বাহিনী আর জনসাধারণকে বিশেষ করে

ভবঘুরেদের পুরে রাখা হত তথাকথিত ত্রাণশিবিরের মধ্যে। সেই সব শিবির ছিল মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত অনেকটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মত। খরা এলাকার মধ্যে খাদ্যহীন জলহীন অবস্থায় ত্রাণপ্রার্থী অধিকাংশ দরিদ্র সোমালিরই কপালে জুটত মৃত্যু।

প্রাক্তন ত্রাণকর্মী মাইকেল মারেনের মতে সোমালিয়া বহু বছরের সাহায্যের (Aid) মাশুল গুণছে। কারণ খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন কীভাবে পাশ্চাত্ত কূটনীতিকরা সাহায্য করার ছলে সোমালিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মহম্মদ সিয়াদ বারের রাজত্বকে মদত দেওয়া হয়েছে যাতে লোহিত সাগরের তীরে বেরবেরায় পূর্বতন সোভিয়েত ঘাঁটিতে পরিণত করা যায়।

১৯৮১ সালের এপ্রিলে তদানীন্তন রেগন সরকারের কৃষিদপ্তরের সচিব জেমস্ ব্লকের চমকপ্রদ স্বীকারোক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। তিনি বলেন "খাদ্যকে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে"। অনেকেরই ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল একথায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সংবাদপত্র দ্রুতই এই উক্তিটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ তারা ভাল করেই জানত যে কথাটা শতকরা একশভাগ সত্যি। মার্কিন কৃষি বাণিজ্য ও খাদ্য সাহায্য হচ্ছে তার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। খাদ্যকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির এক জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বর্তমানে সোমালিয়ার ওপর দখলদারি।

ফাংক ও ওয়াগনেলের এনসাইক্লোপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী সোমালিয়ার অর্থনীতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল পশুপালন ও কৃষির ওপর। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্পদের অভাব তার দুর্ভিক্ষের জন্য মোটেই দায়ী নয়। নিরন্নের এই হাহাকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর শাসকদের দ্বারাই সৃষ্ট। ক্রমাগত সোমালিয়ার অর্থনীতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মার্কিন সাহায্যের ওপর। ইস্রায়েল ও মিশরের পরে সোমালিয়াই ছিল মার্কিন সাহায্যের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহীতা। সেই ১৯৭০ সালে বুশ যখন সি আই. এ'র সর্বময় কর্তা সেই সময় ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে

লড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোমালিয়ায় ৪৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র চালান করে পেন্টাগন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আই. এম. এফ'র ব্যায় সঙ্কোচ কর্মসূচী। ফলে একদিকে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পুরো বন্ধ হয়ে যায় আর অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বিপুলভাবে বেড়ে গিয়ে অর্থনীতিকে করে তোলে বিপর্যস্ত। এই হচ্ছে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। আর মার্কিন দেশের সরবরাহ করা সেই সমস্ত মরণাস্ত্র নিয়েই আজ গোষ্ঠিগুলি আত্মঘাতী লড়াইয়ে নেমেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছ থেকে প্রায় একরকম কায়দা করেই ত্রাণসেনা পাঠানোর দায়িত্ব হাতিয়ে নেয় বুশ সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রধানত মার্কিন সেনা নিয়ে গঠিত যৌথ ত্রাণ সেনাবাহিনী পাঠানো হয় সোমালিয়ায়। গত ডিসেম্বরে প্রায় ৩০ হাজার সশস্ত্র শান্তিরক্ষী ভারতমহাসাগরের উপকূলে অবতরণ করে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, উপদ্রুত এলাকাগুলোতে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন রেস্টোর হোপ' অর্থাৎ আশাহীনের বুকে আশা ফিরিয়ে আনার অভিযান।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের মনিকা মুরহেড্ বলেছেন "ইরাক যুদ্ধের ন'মাস আগে শোয়ার্জকফ কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন যে বিপুল তেল সম্পদের ওপর লাগাতার আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ঘাঁটিসহ স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি কায়েম করা প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন, "এটা মনে রাখা ভালো যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার থেকে শুরু করে জাইরের মোবুতু ও অ্যাঙ্গোলার সাভিম্বি পর্যন্ত সাবা আফ্রিকা জুড়ে সবচেয়ে বর্ণবিদ্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মার্কিন সরকার সমর্থন করেছে"।

মুরহেডের মতে এইভাবে পারস্য ও আরবের ঘাঁড়িতে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার লক্ষ্য পেন্টাগন অর্জন করেছে আর এখন সে চাইছে 'হর্ন অফ আফ্রিকা' বা আফ্রিকার খড়্গ অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে লোহিত সাগরের তীরে সোমালিয়ার এই ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে। প্রায় দু'বছরের ওপর সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষ চলছে। এর আগে

ইথিওপিয়াতেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে গেছে ও তার রেশ এখনও চলেছে। কিন্তু এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন মাথাব্যাথাই ছিলনা। হঠাৎ গত নভেম্বর মাসে বুশ প্রশাসন এমনকি কংগ্রেসের অনুমোদন না নিয়েই সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ওয়াশিংটনের মূল উদ্দেশ্য সোমালিয়ায় আরেকটি অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ৩রা জানুয়ারীর রিপোর্টে বলা হয়েছে, "নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয় মোকাবিলা করার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনী ছোট ছোট শহরে 'অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা কাউন্সিল' তৈরী করতেও সহায়তা করেছে। কাউন্সিলগুলো অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক গ্রুপ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে এরকম কিছু ভাবনা চিন্তা রয়েছে"।

গোটা সোমালিয়া জুড়ে 'অপারেশন রেস্টোর হোপ'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদও শুরু হয়। তাদের শ্যেনদৃষ্টি যে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী ওপেক দেশসমূহ তথা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে এটাও পরিষ্কার হতে থাকে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে উঠেছে মানুষ। ৩রা জানুয়ারী মোগাদিশুতে সেক্রেটারী জেনারেল বুত্রোস ঘালির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। হাজারে হাজারে বিক্ষোভকারী পাথর ছুঁড়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরের দিকে। বুত্রোস ঘালি ও সাংবাদিকরা উপস্থিত হতে পারেন নি নির্ধারিত সভায় ও সাংবাদিক সম্মেলনে।

ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে সম্প্রতি দখলদারির কৌশল পাল্টানো হয়েছে ২৬ মার্চ সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ১লা মের মধ্যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীকে সরিয়ে তার জায়গায় ৩০,০০০ অন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুসারে সোমালিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন ধরণের

বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে এই বাহিনীর। এটাকে বলা হচ্ছে সোমালিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়—ইউনিসোম ২। এর নেতৃত্বে থাকবেন একজন তুর্কী সেনা প্রধান সেভিক বীর।

এর আগে মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বে ইউনিসোম- ১ নামে গতবছর যে অভিযান চালানো হয়েছে তাতে কাংখিত ফল মেলেনি। যুযুধান সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সেনা সংখ্যা শান্তিবাহিনীর সেনা সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে। মার্কিন সেনাদের দখলদার বাহিনীর চোখে দেখে ব্যাপক বিক্ষোভ চলেছে দেশ জুড়ে। লাগাতার সশস্ত্র আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছে তাদের প্রায়শঃই। এতে মার্কিন সেনাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। দেশে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল তারা। তাদের ও তাদের পরিবার পরিজন তথা মার্কিন জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে মার্কিন শান্তিবাহিনীকে।

এই সিদ্ধান্ত শান্তি রক্ষার প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে সন্দেহ নেই। না হলে এর ঠিক পরেই ক্ষুধা ও যুদ্ধ ক্লিষ্ট সোমালিয়ায় শান্তির নতুন উদ্যোগ দেখা যাবে কেন? ২৯ মার্চ মোগাদিশুতে শান্তির নয়াযুগ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের ১৫টি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এতে বক্তব্য রেখেছেন। তার আগে ২৮ মার্চ যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে এক চুক্তি হয়েছে। দু'বছরের বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধের পর এই প্রথম একটা সরকার গঠনের আশা কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গোষ্ঠীনেতারা ফেডারাল ধরণের এক উত্তরণশীল জাতীয় কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশের ১৮টি অঞ্চল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি পাঠানো হবে এই কাউন্সিলে, যার মধ্যে একজনকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে। রাজধানীকে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি আসন আর আলোচনায় অংশ নেওয়া ১৫টি গোষ্ঠী পাবে একটি করে আসন। ১৮টির মধ্যে ১০টি অঞ্চলের আধিপতি ও সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠীপতি মহঃ ফারাহ আইদিদই প্রেসিডেন্ট হবেন বলে মনে হয়।

শান্তির ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা গেলেও অনেকের মতে ক্ষমতার প্রকৃত লড়াই

এবারেই শুরু হবে। ময়দান থেকে যুদ্ধরেখাটা এবার রাজনৈতিক ক্ষমতার মঞ্চের মধ্যেও প্রসারিত হবে। কারণ আপাততঃ সেনা সরিয়ে নিতে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চল থেকে চিরতরের জন্য তার হাত গুটিয়ে নেবে— ইতিহাস তা বলেনা। ইতিমধ্যে দেশের অর্থনীতি যে তিমিরে সে তিমিরেই। কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেই, নেই কোন ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যৎসামান্য পানীয় জল আসছে ট্যাংকারের মাধ্যমে। মানুষের ঠিকানা। লঙ্গরখানা, উদ্বাস্তু শিবির, নয়তো কবরখানা। শুধুমাত্র আধুনিক স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা আর আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ লাঞ্ছিত মানবাত্মার আদিম গোঙানী শুনিয়ে যাচ্ছে বহির্বিশ্বকে।

[সুকান্ত মণ্ডলের এই প্রতিবেদনটি দেশব্রতীর ১৬-৩১ এর মে ১৯৯৩ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।]

———

কোন লেখা গুরুত্বপূর্ণ? যা দশহাজার পাঠক পড়ে, নাকি একটি পাঠক দশহাজার বার পড়ে?